বিজ্ঞান মনস্ক'র মুখপত্র

সমীক্ষণ

প্রথম বর্ষ■সংখ্যা - ১■ডিসেম্বর ২০১০

এই সংখ্যায়

আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় – একটি সামাজিক ব্যক্তিত্ব
জিওদার্নো ব্রুনো
"জল সংকট"-এর সামনে ও আড়ালে
ঘড়ি আবিষ্কারের ইতিহাস
গ্লোবাল ওয়ার্মিং প্রসঙ্গে
গণ হিস্টিরিয়া এবং কেন?
কবিতা
নাটক
গল্প

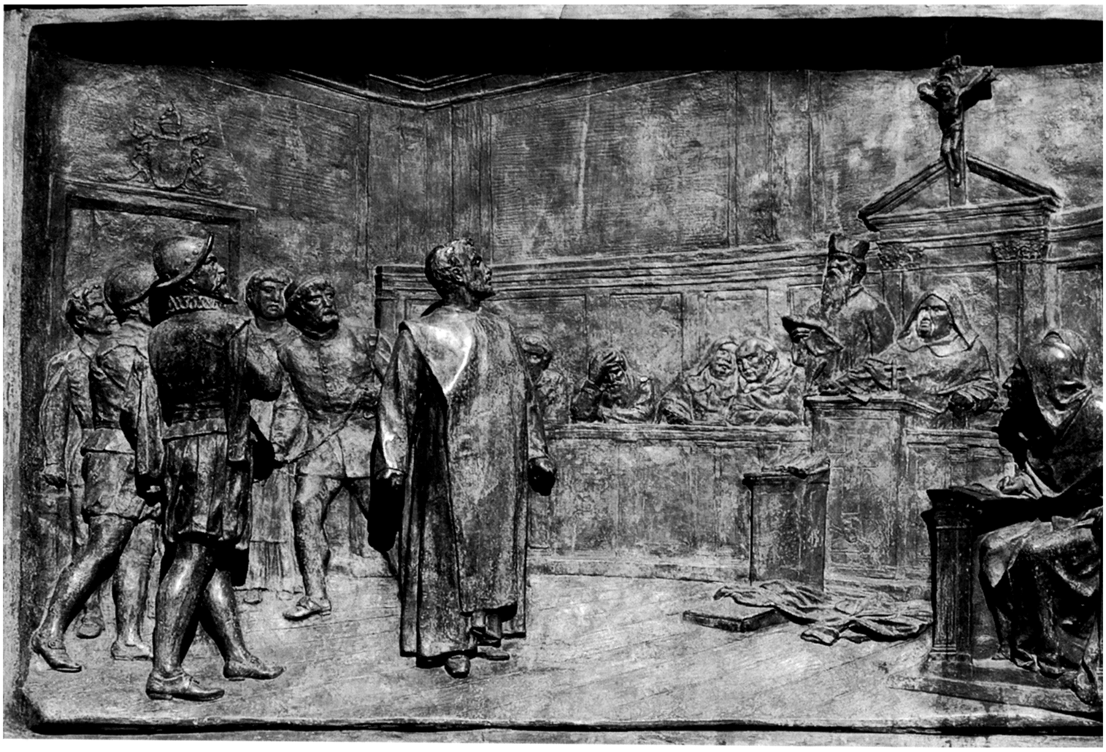

বিচারালয়ে মৃত্যুঞ্জয়ী ব্রুণো

"আমি তোমাদের বিচারের জন্য যে পরিমাণ ভয় নিয়ে অপেক্ষা করে আছি তোমরা তার থেকেও অনেক বেশি ভীত হয়ে সেই বিচার দিলে আর একদিন সবাই সেই সত্যকে দেখতে পাবে যা আজকে আমি দেখছি।"

সম্পাদকীয়

এই প্রকৃতিতে প্রতিনিয়ত ঘটমান ঘটনার এক অতি সামান্য অংশই মানুষ আজ পর্যন্ত আবিষ্কার করতে পেরেছে। কারণ শুধুমাত্র প্রকৃতিকে জানার জন্য, প্রকৃতিকে জয় করার জন্য কেবল গবেষণা হয়নি। বিজ্ঞানের আবিষ্কারের গতি ত্বরণযুক্ত হয়েছে পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে। আর পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় (উৎপাদন) বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার বাজারের লক্ষ্যেই করা হয়। তাই কোন নির্দিষ্ট বস্তুর বাজার সৃষ্টি করতে প্রকৃতি সম্পর্কে যতটুকু জানা প্রয়োজন ততটুকু সম্পর্কেই গবেষণা হয়েছে।

আর এই অতিক্ষুদ্র সংখ্যক আবিষ্কারই পূর্বের বহু সংস্কারকে কুসংস্কার-এ পরিণত করেছে - যা আজ সভ্য মানুষের কাছে বর্জনীয়। কিন্তু প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত অংশের বেশীরভাগ সমেত সমগ্র জনগণের প্রায় সম্পূর্ণ অংশই বস্তুগত বিশ্লেষণ ব্যতিত প্রচলিত ও প্রচারিত বক্তব্য দ্বারা আবেশিত। বিচার-বিশ্লেষণ দ্বারা যাচাই করে দেখার অভ্যাস নেই। তাই তো সারা দেশজুড়ে "গণেশ দুধ খায়", তাইতো ডিস্কো রোগের প্রভাবে পুরুষের পুরুষাঙ্গ লোপ পাওয়ার আশঙ্কায় হাজার হাজার মানুষ আতঙ্কিত, তাইতো নাকালী পাড়ায় পুকুরে ডুব দিয়ে মনস্কামনা পূরণ করার প্রার্থনা করে।

সত্যিই কি গণেশ দুধ খেয়েছে, নাকি খেতে পারে ! (গণেশ নামে কোন ব্যক্তি বা প্রাণী ব্যতীত) সত্যিই কি মানুষের পুরুষাঙ্গ লোপ পেয়েছে, নাকি লোপ পেতে পারে ! ফিজিওলজি-অ্যানাটমি কি বলে? সত্যিই কি নাকালী পাড়ার পুকুরে ডুব দিয়ে মানুষের মনস্কামনা পূরণ হয়েছে, নাকি হতে পারে ? এরকমই আরো অনেক প্রশ্ন। আর এই সব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্যই, "বিজ্ঞান মনস্ক"র আবির্ভাব। দু-চারজন বিজ্ঞান কর্মীর সুপ্ত বাসনার ভ্রূণের একটা এর পূর্ণাঙ্গ রূপে ভূমিষ্ঠ হওয়া বাস্তবায়িত হয় ২০০৯-এর ৭ই জুন।

ঐ দিন ব্রতচারী বিদ্যাশ্রমের একটি শ্রেণী কক্ষে, শতাধিক লোকের উপস্থিতিতে, "জড় থেকে জীব এবং মানুষের আবির্ভাব" শীর্ষক আলোচনা চক্র, আলৌকিক নয় লৌকিক বিষয়ক কিছু বিষয়কে হাতে-কলমে দেখানো এবং একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে, বিজ্ঞান মনস্ক"র পথ চলা শুরু। বর্তমানে ঠাকুরপুকুর ও সোনাপুর অঞ্চলে "বিজ্ঞান মনস্ক" নিয়মিত চলাফেরা করে। তবে বনগাঁ (উঃ ২৪ পরগণা), নাকালী পাড়া, গোচরণ, আমতলা (দঃ ২৪ পরগণা) এলাকায়ও সে প্রয়োজনভিত্তিক ভূমিকা রেখেছে।

২০১০-এর বাৎসরিক অনুষ্ঠানে, আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল, "গ্লোবাল ওয়ার্মিং"।

শুধুমাত্র, "বিজ্ঞান মনস্ক" সংগঠনটির প্রচার ও প্রসার ঘটানোই আমাদের উদ্দেশ্য নয় - বরঞ্চ সমগ্র মানবজাতি বিজ্ঞান মনস্ক হয়ে উঠুক – এটাই আমাদের আকাঙ্খা।

সামাজিক প্রয়োজনীয়তা এবং "বিজ্ঞান মনস্ক"-র কর্মীদের অনুশীলনগত অনুভূতি, মানুষ যাতে সমাজ সচেতন হয়ে বস্তুগত বিশ্লেষণের মাধ্যমে জ্ঞানার্জন করতে পারে এবং জীবনে চলার পথে দৃঢ় থাকতে পারে, তার জন্য কাছে-দূরে সকল মানুষের পাশে সর্বদা উপস্থিত থাকা আবশ্যক। এই আবশ্যকতা পূরণের উদ্দেশ্যে "বিজ্ঞান মনস্ক"-এর পত্রিকা **"সমীক্ষণ"**-এর পদার্পণ।

সমাজের প্রতিটি ঘটনার বস্তুনিষ্ঠ ও বিজ্ঞানভিত্তিক সমীক্ষা চালিয়ে তা থেকে উদ্ভুত জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দেওয়ার সংকল্প নিয়ে ২০১১ সালের নববর্ষের সূচনায় সমীক্ষণ আত্মপ্রকাশ করল। সমীক্ষণের পথচলা সম্পাদকমন্ডলী নয়, পাঠকদের সচেতন অংশগ্রহণের মাধ্যমেই সম্ভব হবে।

আমাদের কথা

প্রাচীনকাল থেকেই অনুসন্ধিৎসু মন মানুষকে প্রকৃতিতে ঘটে চলা প্রত্যেকটি ঘটনার পিছনের কারণ জানার ও তাকে কাজে লাগানোর প্রচেষ্টাই অন্যান্য প্রাণীদের থেকে এগিয়ে দেয় আর গড়ে তোলে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম প্রাণী হিসাবে। অন্যান্য জীবেরা যখন খাদ্যান্বেষণে ঘুরে বেড়াতো তখন মানুষ সেখানে চিন্তা করতো বৃষ্টি কেন হয় বা কি কারণে বৃষ্টি থেকে নিস্তার পাওয়া যায় ইত্যাদি। কিন্তু মানুষ যে এই ক্ষমতা কোনো অতিপ্রাকৃতিক শক্তির থেকে পেয়েছে তা নয়। মানুষকে অর্থাৎ মানুষের পূর্বপুরুষকে অর্থাৎ প্রাইমেটকে এই প্রকৃতিতে যে যে অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়েছে তার মাধ্যমেই মানুষ তার বুদ্ধির প্রয়োগ শিখেছে। পশু থেকে মানুষে রূপান্তরে মানুষের হাতের ব্যবহার এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। অন্যান্য শক্তিশালী প্রাণীরা যখন নিজেদের শক্তির জোরে প্রকৃতিতে বেঁচে থাকতো তখন দুর্বল মানুষকে এই প্রকৃতিতে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার স্বার্থে নিজের বুদ্ধির প্রয়োগ করতে হয়েছিল। অতিকায় হাতি যখন মানুষের ছোঁড়া পাথরের টুকরোর আঘাতে পালিয়ে যায় তখন মানুষ নিজের আত্মরক্ষার উপায় খুঁজে পেল। ধীরে ধীরে মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনে ঘটে চলা প্রতিটি কারণকে অনুসন্ধান করার প্রচেষ্টা করতে থাকে। এইভাবে ধীরে ধীরে মানুষ উন্নত থেকে উন্নততর হয়ে বর্তমানের সময়ে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু উন্নতির সাথে সাথে মানুষ শিখেছে একজন মানুষ হয়ে অন্য একজন মানুষকে শোষণ ও নিপীড়ন করতে, আর তার সাথে সাথেই মানুষের অজানাকে কাজে লাগিয়েই মানুষই সৃষ্টি করেছে দেবতা, ঈশ্বর তথা ভগবানকে। অজানার চোরাগলি দিয়ে ঢুকে পড়া “অতিপ্রাকৃতিক শক্তি” মানুষই নিজের স্বার্থ সিদ্ধি করার বাসনায় লালন-পালনে ঈশ্বর অথবা ভগবানের রূপ ধারণ করেছে। বিজ্ঞান কী ? বিজ্ঞান হল প্রতিটি ঘটনার পিছনের কারণ, অর্থাৎ কোন ঘটনা কেন ঘটেছে তার উত্তরই ওই ঘটনা ঘটার বিজ্ঞান। বিজ্ঞান প্রকৃতি তথা মানুষের জীবনের প্রত্যেক দিনের প্রতিটি ঘটনার পেছনেই বিদ্যমান।

বিজ্ঞানকে বইয়ের কয়েদখানা থেকে বের করে ব্যাপক মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে বিজ্ঞান মনস্কের যাত্রা শুরু হয়। বিজ্ঞান মনস্ক যুক্তিবাদী প্রদর্শনের মাধ্যমে মানুষের ভিতরে জমে থাকা কুসংস্কারের জগদ্দল পাথরকে ধাক্কা মারার প্রচেষ্টা করেছে, জ্যোতিষশাস্ত্রের মূল অবৈজ্ঞানিক জায়গাকে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করেছে এবং তার বিরুদ্ধে পোষ্টার প্রদর্শনী ও আলোচনামূলক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে লড়াইয়ের প্রচেষ্টা করেছে। কুসংস্কার বিরোধী আন্দোলন ছাড়াও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ভূপালের গণহত্যার নিন্দা করেছে, দোষীদের শাস্তির দাবী জানিয়েছে। এছাড়া অল্প কিছুদিন আগে সারা পশ্চিমবাংলায় কোরো সিনড্রোম, যার চলতি ভাষায় “ডিস্কো রোগ” নিয়ে যে গণ-হিস্টিরিয়া ছড়িয়ে পড়েছিল তার বিরুদ্ধে তার ক্ষুদ্র শক্তি নিয়ে লড়াইয়ে নেমেছিলো। আমাদের এই লড়াইয়ে আমরা বেশ কিছু মানুষের সান্নিধ্য লাভ করেছি যারা প্রকৃত অর্থে বিজ্ঞান মনস্ক মানুষ। যাদের সহযোগিতায় আমরা আমাদের এই লড়াইয়ে সফল হতে পেরেছি। বিজ্ঞান মনস্ক খাদ্যে ভেজাল নিয়ে মানুষকে সচেতন করার কাজ করেছে এবং ব্যবসাদাররা কেন ভেজাল দেয় এবং প্রতিকারের পথ কী তাও জনসমক্ষে তুলে ধরেছে।

বিজ্ঞান মনস্ক তার আবির্ভাবের সময় থেকেই বিভিন্ন বিষয়ের চর্চা ও তার প্রয়োগ করে এসেছে একটি মাত্র উদ্দেশ্যে তা হল ব্যাপকতর মানুষের মনে বিজ্ঞান চেতনার উন্মেষ ঘটিয়ে সমাজের যে বিজ্ঞান সত্ত্বা আজ বিভিন্ন কুসংস্কারের তলায় নিমজ্জিত আছে তার মুক্তি ঘটানো। ব্যাপক মানুষের স্বার্থে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের প্রয়োগের জন্য বিজ্ঞান আন্দোলন সংগঠিত করা। ‘বিজ্ঞান মনস্ক’র এই প্রচেষ্টার নবতম সংযোজন হিসাবে যুক্ত হতে চলেছে এই পত্রিকা যার সফলতা নির্ভর করছে ব্যাপকতর মানুষের অংশগ্রহণের মাধ্যমে। তাই আমরা বিজ্ঞানের মুক্তিকে আরও দ্রুততর করার উদ্দেশ্যে সকল মানুষের কাছে **সমীক্ষণ**-এর মাধ্যমে আবেদন রাখছি আমাদের এই উদ্যোগকে সফল করার জন্য। ■

নিবন্ধ

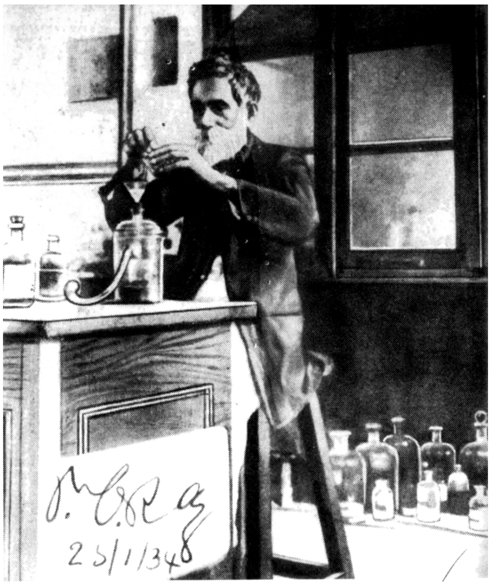

আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় – একটি সামাজিক ব্যক্তিত্ব

[*জন্মের সার্ধশতবর্ষ উপলক্ষে বিজ্ঞানী প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের স্মরণে এই রচনাটি পেশ করা হল।*]

আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় শুধুমাত্র একজন রসায়নবিদ (বৈজ্ঞানিক) ছিলেন না, একথা অনেকেই জানেন। ইতিহাস, সাহিত্য চর্চা এবং বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন এবং সাধারণ ছাত্র সমাজের সামনে সেই জ্ঞান থেকে শিক্ষা গ্রহণ এর উপায় হাজির করাই ছিল তার নেশা, কুসংস্কার , জাতিভেদ প্রথা, বর্ণভেদ প্রথা, অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা ছিল। সকলেরই জানা আছে যে তাঁর মতন ছাত্রদরদী শিক্ষক আজও বিরল। কিন্তু তাঁর যে বিষয়টি বহুল প্রচারিত নয় তা হল, তিনি ছিলেন একজন "সমাজ বিজ্ঞানী" – এ বিষয়ে জানা যায় তাঁর বিজ্ঞানের ইতিহাস সম্পর্কিত লেখা থেকে। তাঁর আত্মজীবনীতে তিনি লিখেছেন যে, ভুলক্রমে তিনি একজন বিজ্ঞানী হয়ে গেছেন।

তিনি ১৮৬১ খ্রীঃ এর ২রা আগস্ট যশোরের (অধুনা বাংলাদেশের খুলনা জেলা) বারুলী গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা হরিশচন্দ্র রায় ছিলেন স্থানীয় জমিদার পরিবারের সন্তান এবং তিনি ফার্শি ও ইংরেজী ভাষাতে পারদর্শী ছিলেন, আর কাজ চালানোর মতন সংস্কৃত ও আরবী ভাষাও জানতেন। মাতা ভুবনমহিনী দেবী ছিলেন উদারমনা। তাঁর বাবার প্রতিষ্ঠিত স্কুলেই প্রফুল্ল রায় এর লেখাপড়ার সূচনা হয়। কিন্তু স্কুলে না যাওয়ার অভ্যাসের জন্য লেখাপড়ায় তার আশানুরূপ উন্নতি ঘটছিল না। ছেলেদের লেখাপড়া শেখানোর উদ্দেশ্যে হরিশচন্দ্র রায় ১৮৭০ সালে কলকাতায় চলে আসেন। ১৮৭১ সালে প্রফুল্ল চন্দ্র রায় ও তাঁর দাদা নলিনীকান্ত রায়, ডেভিড হেয়ার প্রতিষ্ঠিত হেয়ার স্কুলে ভর্তি হন। গ্রাম্য স্বভাবের জন্য সহপাঠীদের অনেক বিদ্রুপ তাঁকে সহ্য করতে হয়েছিল। ঐ সময় তিনি আমশয় রোগে মারাত্মক ভাবে আক্রান্ত হয়ে ২ বছরের জন্য স্কুলের পাঠ বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন। কিন্তু ঐ দু বছর সময়কালে তিনি ইংরাজী সাহিত্য, ইতিহাস বিভিন্ন ব্যক্তি ও বৈজ্ঞানিকের আত্মজীবনী এবং ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষা শিক্ষালাভ করেন। কোন দিনই তিনি শুধুমাত্র পাঠ্য পুস্তকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেন নি। ১৮৪৭ সালে, কেশবচন্দ্র সেনের অ্যালবার্ট স্কুলে তিনি ভর্তি হন। ১৮৭৯তে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করে মেট্রোপলিটন কলেজে (বর্তমান বিদ্যাসাগর কলেজ) এফ এ (ফার্স্ট আর্টস) ক্লাসে ভর্তি হন। ঐ সময় তাঁর বাবার

আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ হওয়ায়, তিনি মেট্রোপলিটন কলেজে ভর্তি হন কারণ ঐ কলেজের টিউশন ফি কম ছিল। কলেজের মাহিনা ছিল ৩ টাকা – যা তৎকালীন স্কুলের মাহিনার সমান। রসায়ন তখন এফ এ ক্লাসের একটি আবশ্যকীয় পাঠ্য বিষয় ছিল। ঐ সময় প্রেসিডেন্সি কলেজে বহিরাগত ছাত্র রূপে তিনি পদার্থ বিদ্যা ও রসায়নের ক্লাস করতে যেতেন। পেডলার সাহেবের পড়ানো দ্বারা মুগ্ধ হয়ে নিজের অজান্তে রসায়ন বিষয়ে আসক্ত হয়ে পড়েন এবং নিজেই কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করে দেন।

'পুত্রর বিদেশে গিয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ' – পিতার এই ইচ্ছা পূরণের সাধ তাঁর ছিল কিন্তু আর্থিক সাধ্য ছিল না। সাধ্য আর সাধের এই বিরোধকে ব্যক্তিগতভাবে সমাধানের জন্য গিলক্রিস্ট স্কলারশিপ এর জন্য তিনি তৈরী হন – যা এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দেওয়া হত। পৃথিবীর সমস্ত ছাত্ররা এতে অংশগ্রহণ করতে পারত। ভারতবর্ষ থেকে প্রথম প্রফুল্ল রায় ও মুম্বাই-এর এক ছাত্র এই স্কলারশিপ পান। ১৮৮২ সালের মধ্যভাগে, ঐ স্কলারশিপ নিয়ে তিনি ইংল্যান্ডে পৌঁছান। সেখানে প্রবাসী বাঙালী জগদীশ চন্দ্র বোসের সঙ্গে তার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। জগদীশ চন্দ্র বোস তখন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। প্রফুল্ল চন্দ্র রায় এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে বি এস সি ক্লাসে ভর্তি হন। আলকজান্ডার ব্রাউন-এর অধীনে অধ্যয়ন শুরু করেন। ঐ সময় তিনি প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রদের প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। "ইন্ডিয়া বিফোর অ্যান্ড আফটার মিউটিনি" – বিষয়ে তার লেখা প্রবন্ধ কোন পুরস্কার না পেলেও সেদেশে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

১৮৮৫ সালে বি এস সি এবং ১৮৮৭ সালে ডি এস সি সম্পন্ন করার পর এক বছর তিনি এডিনবার্গ ইউনিভারসিটির কেমিক্যাল সোসাইটির ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৮৯ সালে দেশে ফিরে তিনি এক বছর চাকরীর সন্ধানে ঘুরে বেড়ান। ঐ এক বছরে তিনি জগদীশ চন্দ্র বোস এর বাড়ীতে থেকে উদ্ভিদ ও প্রাণী বিষয়ে গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন। এরপর বিভিন্ন সহযোগিতায় প্রেসিডেন্সী কলেজে সহকারী অধ্যাপক রূপে যোগ দেন এবং পাশাপাশি গবেষণার কাজ চালিয়ে যান।

১৮৯৬ সালে তাঁর আবিষ্কৃত **মারকিউরাস নাইট্রাইট** যৌগটি প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে আন্তর্জাতিক চরিত্র দান করে। তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন – এই যৌগটি তাঁর জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে, কিন্তু এই আবিষ্কারটি আকস্মিক ঘটেছে। যে কোন নাইট্রাইট যৌগ অত্যন্ত অস্থায়ী, কিন্তু তার আবিষ্কৃত মারকিউরাস নাইট্রাইট যৌগটির স্থায়ীত্ব অনেক বেশী। এই যৌগটি ব্যবহার করে তিনি হেটারোসাইক্লিক, অ্যালিসাইক্লিক, পিপারাজিন শ্রেণীর বহু নাইট্রাইট যৌগ তৈরী করেন। পরবর্তীকালে তিনি পারদের নাইট্রোজেন ঘটিত আরো অনেক যৌগ তৈরী করেন। প্রতিটি পরীক্ষা তিনি ২ থেকে ৩ ডজন বার করে দেখে তবে সিদ্ধান্তে পৌঁছান। **১৯১২** সালের **১৫ই** আগস্ট 'নেচার' পত্রিকায় তার গবেষণার কথা প্রকাশিত হয়।

আর্থিক স্বনির্ভরতা ছাড়া দেশের অগ্রগতি সম্ভব নয় – এই অর্থে তৎকালীন বেকার সমস্যার সমাধানের পথ-প্রদর্শক রূপে তিনি ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে **'বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস'** প্রতিষ্ঠায় প্রধান ভূমিকা রাখেন। এটিই ভারতে প্রথম দেশীয় ঔষধ তৈরীর কারখানা। 'সোডার ফসফেট' এবং 'সুপার ফসফেট অফ লাইম' তৈরীর জন্য রাজাবাজার এলাকা থেকে তিনি গরুর কাঁচা হাড় জোগাড় করতেন এবং নিজের বাড়ীর ছাদে ঐ হাড় রোদে শুকোতেন। তৎকালীন সামাজিক পরিস্থিতিতে যা ছিল অত্যন্ত কঠিন কাজ। এই প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে রসায়ন শিল্প কারখানার কাজ এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য তিনি 'বোন অ্যাশ' তৈরী করেন এবং সালফিউরিক অ্যাসিডের সঙ্গে তার বিক্রিয়ায় 'সুপার ফসফেট অফ লাইম' তৈরী করেন। এরপর বেঙ্গল কেমিক্যালের প্রোডাক্টের সংখ্যা ও প্রসার দিনে দিনে বাড়তে থাকে।

তাঁর রচিত বইগুলি – **(১) সরল প্রাণী বিজ্ঞান (২) রাসায়নিক পরিভাষা (৩) দেশী রঙ (৪) খাদ্য বিজ্ঞান (৫) বিশ্ববিদ্যালয়ের তকমা ও শিল্প ব্যবসায়ের কৃতিত্ব লাভ।**

বিভিন্ন পত্রিকায় বাংলাভাষায় তার লেখা কয়েকটি প্রবন্ধ হল –

(১) প্রাণীদিগের দংশন কাহাকে বলে
(২) প্রকৃতির আহ্বান
(৩) ব্যবসাবাণিজ্য ও বাঙালীর সমস্যা
(৪) অন্নসমস্যা ও গোপালন
(৫) প্রাচীন ভারতে রসায়নশাস্ত্র চর্চা।

লেখার বিষয় বস্তুগুলি ইঙ্গিত দেয় – মানুষের ব্যবহারিক জীবনে এগুলির গুরুত্ব কি অপরিসীম।

আমাদের দেশে প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি, পাঠ্য বিষয়কে মুখস্ত করার চেষ্টা ইত্যাদি নিয়ে তার মন্তব্য – **"পুস্তকগত বিদ্যা তদৃশ ফলবতী হয় না। প্রাণীতত্ত্ব প্রকৃতরূপে শিক্ষা করিতে হইলে পুস্তক অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ জন্তু**

পরিদর্শন ও জীবদেহ ব্যবচ্ছেদ করা অত্যাবশ্যক। ... আমাদের বাল্যকাল হইতে প্রধান দোষ এই যে জ্ঞাতব্য বিষয় কণ্ঠস্থ করিবার চেষ্টা করি। পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা ভিন্ন প্রকৃতিতত্ত্ব কখনোই সম্যকরূপে উপলব্ধি হয় না। ... পুঁথিগত বিদ্যাই আমাদের সর্বনাশের মূল।"

কুসংস্কার, ভ্রান্তধারণার বশবর্তী হয়ে, আত্মশক্তির উপর বিশ্বাস হারিয়ে ক্রমশ অন্ধকারের দিকে এগিয়ে চলা নিয়ে তাঁর মন্তব্য –

"... আমি কিছুই করিতে পারি না, আমাকে কিছুই করিতে হইবে না, মায়ের কাছে জোড়া মহিষ মানিব, পীর পয়গম্বরের দরগায় সোয়া পাঁচ আনা সিন্নি দিব, আর আমার অভিষ্ট সিদ্ধ হইবে ইত্যাদি বিশ্বাস আসিয়া দুর্বলচিত্ত মনকে আশ্রয় করে। স্বাধীন চিন্তা বিসর্জনের ইহাই সর্বশেষ অধ্যায়।"

পশুপালনের প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে তার মন্তব্য –

" ... আমার মনে হয় শীঘ্রই এমন আইন প্রচলন হওয়া দরকার যাহাতে প্রত্যেক গ্রামে যথেষ্ট পরিমাণ গো-চারণের মাঠ, সুরক্ষিত থাকে। ..."

প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁর সমসাময়িক দেশীয় ব্যক্তিত্বদের থেকে যে পৃথক ছিলেন তার প্রতিফলন দেখা যায়, **'আ হিস্ট্রি অফ হিন্দু কেমিস্ট্রি'** বইটিতে। এই বইটিতে তিনি যা লিখেছিলেন এবং তাঁর ব্যক্তি জীবনে তারই সচেতন প্রয়োগ সমাজে জাতিভেদ প্রথার অবসানের ঐকান্তিক ইচ্ছার প্রতিফলন। হিন্দু রসায়নের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে তাঁর বৃহৎ ও সুগভীর গবেষণা কতটা বস্তুনিষ্ঠ ছিল তা প্রমাণিত হয় যখন তিনি সভ্যতার আদিযুগ থেকে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতবর্ষে বিজ্ঞান গবেষণা ও তার প্রয়োগের পশ্চাৎগতির কারণ ব্যাখ্যা করেন। ভারতবর্ষে রসায়ন শাস্ত্র অধ্যয়ন ও গবেষণার ক্ষেত্রে অগ্রগতির এক ঐতিহ্যময় অধ্যায় তিনি তুলে ধরেন – আয়ুর্বেদ, ধাতুবিদ্যা, কাপড় রাঙানো রঙ, তান্ত্রিক আচারে পারদের ব্যবহার এর ইতিহাস সামনে এনে। রসায়নশাস্ত্রের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান প্রক্রিয়া ডিস্টিলেশন পদ্ধতির উদ্ভাবনে প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞানীদের ভূমিকার কথা তিনি উল্লেখ করেন। অ্যালকোহল প্রস্তুতি প্রক্রিয়া প্রথমে ভারতে উদ্ভাবিত হয় এবং পরে আরব অ্যালকেমিস্টদের দ্বারা ইউরোপে প্রবর্তিত হয়। সে সময় গ্রীক ও আরব সভ্যতার সঙ্গে ভারতীয় বিজ্ঞানের নানাবিধ আদান-প্রদান-এর কথা তাঁর লেখায় উঠে এসেছে।

কিন্তু এই রচনাটিতে তাঁর যে মৌলিক অবদান আছে তা হল ভারতে বিজ্ঞান চর্চায় পশ্চাৎগতির কারণ ব্যাখ্যা। বিজ্ঞান চর্চায় অগ্রগতি ও পশ্চাৎগতির যে সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের উপর নির্ভর করে – তা তিনি বস্তুনিষ্ঠভাবে ব্যাখ্যা করেন। তাঁর এই মৌলিক অবদান তাঁকে সমাজ গবেষকে রূপান্তরিত করেছে। এখানেই তিনি তার সমসাময়িক সকল ব্যক্তিত্ব থেকে পৃথক। বিজ্ঞান যে তার আর্থসামাজিক প্রেক্ষিতের ঊর্দ্ধে অবস্থিত বিশুদ্ধ জ্ঞানের অন্বেষণ নয়, বরং তার সমকালীন সমাজের উৎপাদন সম্পর্কের প্রতিফলন – তাঁর রচনায় এ বক্তব্য পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে।

ভারতে বিজ্ঞান চর্চার অবনতির কারণ রূপে ঐতিহাসিকদের বহুল প্রচলিত মুসলমান আক্রমণ ও হিন্দু দমনের সঙ্কীর্ণবাদী মতবাদকে বর্জন করে তিনি দেখান যে, মুসলমান আক্রমণের অন্ততঃ তিনশ বছর আগে ৬-৭ শতাব্দীতে বিজ্ঞান চর্চার অবনতির সূচনা হয়। গুপ্ত যুগের পর থেকেই এই ক্রমাবনতির শুরু। সেই সময় আর্যভট্ট, বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত ইত্যাদির পর আমরা শুধু ১২ শতাব্দীতে দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য ও ১৪ শতাব্দীতে মাধবাচার্যকে পাই। বহু শতাব্দী ব্যাপী এই ক্রমাবনতির (শূন্যতার) কারণ অনুসন্ধান করে প্রফুল্ল চন্দ্র যে সিদ্ধান্তে উপনীত হন,

তা হল –

(১) বহু শতাব্দী থেকে চলে আসা বর্ণভেদ প্রথাই ভারতবর্ষের সর্বত্র চিন্তক (থিঙ্কার্স) ও কারক (ডুয়ার)-এর মধ্যে এক গভীর প্রভেদের সৃষ্টি করেছে এবং বর্ণ ভিত্তিক এক বংশানুক্রমিক শ্রমবিভাজনের সৃষ্টি করেছে। ভারতে সকল তাত্ত্বিক জ্ঞানের অধিকারী ছিল উচ্চবর্ণের বিশেষত ব্রাহ্মন বর্ণের লোকেরা। শুধুমাত্র তাত্ত্বিক জ্ঞানের ও চিন্তার অধিকারী উচ্চবর্ণের লোকেরা ছিলেন তা নয়, কায়িক শ্রমের প্রতি ছিল তাদের গভীর অনীহা। এমনকি কায়িক শ্রম ও কায়িক শ্রমকারীর প্রতিও ছিল ঘৃণা। আর কায়িক শ্রমের দায়িত্ব ছিল নিম্নবর্ণের লোকেদের, প্রধানত শূদ্রদের – যাদের মধ্য থেকে আসত কারিগর সম্প্রদায়।

এই কারিগর সম্প্রদায়ের তাত্ত্বিক জ্ঞান ও চিন্তার কোন অধিকার ছিল না, বরঞ্চ তাদের ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক জ্ঞানের অন্বেষণ অনেক সময় নিয়ে আসত কঠোর শাস্তি। এই তাত্ত্বিক জ্ঞান ও কায়িকশ্রমের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা বিজ্ঞানের তত্ত্বের প্রয়োগে রূপান্তরিত হতে দেয় নি যেমন, তেমনি আবার প্রয়োগে না যাওয়ায় সংশোধনের সুযোগও হয় নি, বিকাশও ঘটেনি। কায়িক শ্রমের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের শুধুমাত্র নির্দেশ পালনের মধ্য দিয়ে বৌদ্ধিক বিকাশ স্তব্ধ হয়। এরফলে হাতে কলমে পরীক্ষা ও প্রয়োগমূলক বিজ্ঞানের "ভ্রূণ হত্যা"

সামাজিকভাবেই ঘটেছিল। এই কারণে শুধুমাত্র গণিতশাস্ত্র, জ্যোতির্বিজ্ঞান জাতীয় বিমূর্ত তাত্ত্বিক চিন্তার ক্ষেত্রে তৎকালীন ভারতে উৎকর্ষতা লাভ করেছিল।

২) বিজ্ঞান চর্চায় অবনতির ক্ষেত্রে দ্বিতীয় কারণটি হল – **অষ্টমশতাব্দীতে আদি শঙ্করাচার্যের দ্বারা প্রবর্তিত অদ্বৈতবাদ। অদ্বৈতবাদের মাধ্যমে বস্তুবাদ বিরোধী মায়াবাদকে ভারতে চিন্তা জগতে প্রধান দর্শন রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।** শঙ্করাচার্যের মতে **দৃশ্যমান তামাম বিশ্বপ্রকৃতি আসলে মায়া বা মিথ্যা।** তবু কেন দেখি? শঙ্করাচার্যের মতে ও কিছু নয়। অজ্ঞানের ঘোরে দড়িকে সাপ দেখার মতন। শঙ্করাচার্যের বক্তব্য বিশ্বাস করলে বিশ্ব প্রকৃতির নিয়মকানুন গভীরভাবে জানার চেষ্টাই বৃথা। শঙ্করাচার্যের তত্ত্ব প্রকৃতি সম্পর্কে জানার আগ্রহে অনীহা সৃষ্টি করে – যা বিজ্ঞান বিরোধী।

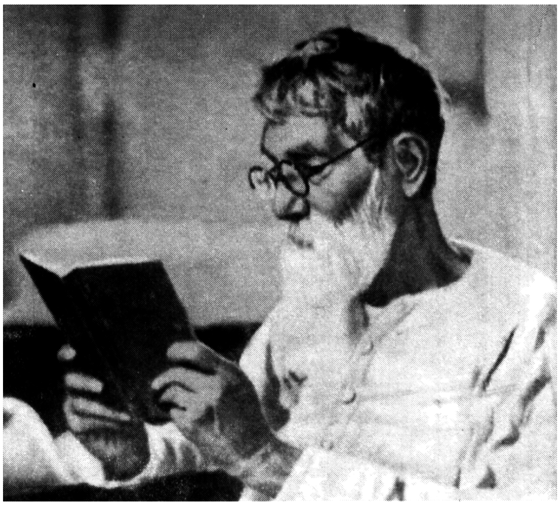

৩) তৃতীয় কারণটি হল **– বেদান্ত শাস্ত্রে - মনু সংহিতায় শবদেহ ছোঁয়া নিষেধ থাকা – যা শল্য চিকিৎসার অগ্রগতিতে সবচেয়ে বড় বাঁধা**। শবদেহ ব্যবচ্ছেদ ব্যাতিত শারীরবিদ্যা ও মানবদেহতন্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন অসম্ভব। এই অসম্ভবই স্থায়ীত্ব লাভ করেছে সামাজিক-রাজনৈতিক কারণে।

প্রফুল্ল চন্দ্র রায় এমন এক ব্যক্তিত্ব ছিলেন যিনি কেবলমাত্র শিক্ষার জগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলেন না। ইংল্যান্ডে রসায়নশাস্ত্র নিয়ে পঠন-পাঠন-এর পাশাপাশি সেদেশের শিল্প, কৃষি, পশুপালন ব্যবস্থা সব কিছুই গভীরভাবে লক্ষ্য করেন। ইংল্যান্ড থেকে ফিরে, রসায়ন চর্চার পাশাপাশি এদেশের মানুষের সাধারণ সমস্যাগুলি চিহ্নিত করেন এবং সেগুলি সমাধানের একক ঐকান্তিক প্রচেষ্টার দুঃসাহসিক পদক্ষেপ ও আত্মত্যাগ তাঁর সমগ্র কর্মজীবনে ফুটে উঠেছে। তিনি, ভারতে বিজ্ঞানচর্চা পিছিয়ে যাওয়ার কারণ যে বর্ণাশ্রম ও তৎকালীন দর্শনের প্রভাব – তা ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি নির্ভুলভাবে বিশ্লেষণ করেছেন যে এদেশের মানুষের চরম দুঃখ-দুর্দশার মূলে আছে বিজ্ঞান চর্চা ও তার প্রয়োগের অভাব। আর এর কারণ হল সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট। কিন্তু প্রফুল্ল চন্দ্র রায় উপলব্ধি করতে পারেননি যে শুধুমাত্র বর্ণভেদ প্রথার অবসান, শোষণহীণ সমাজ গঠন করতে পারে না, বলা ভাল – শ্রেণীহীন সমাজ ছাড়া বর্ণভেদ প্রথার অবসান সম্ভব নয়। যে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের জন্য সমাজের বৈষম্য বজায় আছে, তার অবসান ছাড়া বৈষম্য দূর হওয়া সম্ভব নয়। তাঁর বর্ণময় কর্মজীবনে ভারত ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ উপনিবেশ। তিনি তাঁর অনেক রচনায় স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন দেখেছেন কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনভাবেই অংশ নেননি। প্রধানতঃ তাঁর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল কেমিক্যালকে সামগ্রিকভাবে জাতীয়তাবাদী শিল্প প্রতিষ্ঠানও বলা যায় না। কারণ বিলাতি পণ্যের বিকল্প হিসাবে জাতীয় শিল্পের বিকাশ ঘটান এই প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না। প্রথম সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সরকারকে যুদ্ধের প্রয়োজনীয় নানা সামগ্রি (অসুস্থ সৈনিকদের বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য স্ট্রেচার সহ) সরবরাহ করে বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রচুর মুনাফা অর্জন করেছিল। সমকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনে তিনি মূলতঃ গাঁধীবাদী লাইনেরই পক্ষ নিয়েছিলেন এবং ব্রিটিশের সাথে আপোষের পথেই স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতেন। আচার্য রায় ইংল্যান্ড তথা পশ্চিম ইউরোপের শিল্প বিপ্লব ও রেনেসাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ঔপনিবেশিক-আধা সামন্ততান্ত্রিক ভারতে তাঁর অনুকরণে সংস্কার চেয়েছিলেন। ফলে তাঁর নিরলস কর্মযজ্ঞ তাঁর জীবৎকাল তথা পরবর্তিকালেও সাফল্য অর্জন করেনি। দেশের অধিকাংশ জনগণ আজও দারিদ্র, অশিক্ষা ও কুসংস্কারে নিমজ্জিত রয়ে গেছে। তাঁর সারাজীবনের অমূল্য সৃষ্টির বেশীরভাগই নিষ্ফলা থেকে গেছে।■

আমাদের আদর্শ - সংগ্রামের প্রতীক

জিওদার্নো ব্রুনো

(জন্ম ঃ ১৫৪৮ সাল, মৃত্যু ঃ ১৬০০ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী)

রবীন গুহ

১৫৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ইতালির নোলাতে এক সৈনিক পরিবারে জন্ম হয় ফিলিপ্পো ব্রুনোর। তাঁর পিতা ছিলেন জিওভান্নি ব্রুনো এবং মাতা ছিলেন ফ্রাউলিস্সা সাভোলিনো। কৈশোরকালে তাঁকে নেপলস এ পাঠানো হয় পড়াশোনার জন্য। ১৭ বছর বয়সে নেপলস-এর সান ডোমিনিকো ম্যাজাও-এ ডোমিনিশিয়ান চার্চে পাঠানো হয় যেখানে জিওদার্নো ক্রিপস নামক এক ধর্মগুরুর নামে তার নাম রাখা হয় জিওদার্নো। তার নামকরণ হয় তৎকালীন সময়ের ক্যাথলিক চার্চের নিময় অনুসারে। ওইখানে পড়াশোনা করতে করতে তিনি ২৪ বছর বয়সে পাদ্রী হন। সেই সময় থেকেই ব্রুনো বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর প্রতিভার পরিচয় দিতে থাকেন। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর রচনা বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। তিনি সর্বাধিক জনপ্রিয় হন 'আর্ট অফ মেমারি'-তে তাঁর দক্ষতার জন্য। এই সময়তেই তার অত্যন্ত জনপ্রিয় রচনা **"The Signs of time"** রচিত হয়, ১৫৮০-১৫৮১ সালে তিনি ফ্রান্সে যান। সেখানে তিনি দর্শনের লেকচারার হিসাবে নিযুক্ত হন। ১৫৮৩-র এপ্রিলে তিনি তৃতীয় হেনরীর আমন্ত্রণে ইংল্যান্ডে আসেন। এমনকি অক্সফোর্ডেও তিনি লেকচারার হিসাবে অল্প কিছুদিন কাজ করেন। এই সময়তেই তিনি কোপারনিকাসের **"সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবী ঘোরে"** এই তত্ত্বের হাতে-কলমে পরীক্ষা করেন ও এর সত্যতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হন ও এই তত্ত্বে পক্ষে আলোচনাও শুরু করেন, যার জন্য তাঁকে ভীষণভাবে সমালোচিত হতে হয়। এই সময়কালেই তিনি রচনা করেন

"ইটালিয়ান ডায়ালগস্"। তিনি জ্যোতিবিজ্ঞানের প্রতি ভীষণভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন ও বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষাও করতেন। এরই ফলস্বরূপ জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে ৪টি বইও রচনা করেন, এর মধ্যে 'লা মেনা ডে লে কেনেরী' (দ্যা অ্যাশ ওয়েডনেসডে সাপার) সবটাইতে বেশি বিতর্কের সৃষ্টি করে। এই সময় থেকেই ব্রুনোর বিতর্কিত মন্তব্যের জেরে তাঁর বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করে কিন্তু তিনি কোনও মতেই বিজ্ঞানভিত্তিক সত্যে সঙ্গ ত্যাগ করেন নি।

পরবর্তীকালে ১৫৮৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এক অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে প্যারিসে আসেন। এই সময় থেকেই তিনি **অ্যারিস্টটলের "ভূকেন্দ্রিক বিশ্বের"** বিরোধিতা করতে থাকেন ও কাগজে লেখা লিখে বিলি করতে থাকেন। গাণিতিক ফ্যাব্রিজও মোরদন্তের সাথেও তর্ক-বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। এ সবের জন্য তাঁকে প্যারিস ত্যাগ করে জার্মানী চলে যেতে হয়। জার্মানীর উইটেবার্গ-এ শিক্ষকতা শুরু করেন। এইখানে তিনি অ্যারিস্টটলের বিভিন্ন রচনা নিয়ে প্রায় দু'বছর চর্চা করেন ও বিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করে অ্যারিস্টটলের রচনাগুলির বিশ্লেষণ করেন। এর জন্য তাঁকে বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়, বিভিন্ন জায়গা থেকে বিতাড়িত হতে হয়। বিজ্ঞানভিত্তিক সত্যের উপর তাঁর বিশ্বাস ও তার সপক্ষে প্রচার তাঁকে তৎকালীন ধর্মাবলম্বীদের কু-নজরে নিয়ে আসে। এই অস্থির পরিস্থিতির মধ্যেও তিনি লাতিন ভাষায় বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করেন। **"দে ম্যাজিয়া"** (অন ম্যাজিক), **"দীজ দে ম্যাজিয়া'** (দীজ অন ম্যাজিক) হল অন্যতম দুটি গ্রন্থ।

এরপরে ১৫৯১ সালে ভেনিসে ব্রুনো পাউদা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতের অধ্যাপনার জন্য আমন্ত্রণ পান, এর পাশাপাশি 'আর্ট অফ মেমারি' শেখানোর জন্যও তাঁকে অনুরোধ করা হয়। এই সময়ে "ভূ-কেন্দ্রিক বিশ্বে"-র বিপক্ষে তাঁর ব্যাপক প্রচার তাঁকে চার্চের চক্ষুশূল করে তোলে। ১৫৯৩ সালে, চার্চের বিরুদ্ধাচরণ করার জন্য তাঁকে রোমে নিয়ে আসা হয় ও কারাদন্ড দেওয়া হয়। এই সময়ে তাঁর বিচারও চলতে থাকে। বিচার চলাকালীন তাঁর বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি অভিযোগ আনা হয়। অভিযোগগুলির মধ্যে প্রধানতম হল ক্যাথলিক চার্চের "ভূ-কেন্দ্রিক বিশ্বের" বিরোধিতা করা ও এর ব্যাপক প্রচার করা। ৭ বছর ধরে বিচারের শেষে তাঁকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার শাস্তি বিধান হয়। এই ৭ বছর বন্দী জীবনে তাকে প্রায় বস্ত্রহীন অবস্থায় এক সীসার ঘরে রাখা হয় এর ফলে দিনের বেলায় যেমন তাঁকে প্রচন্ড গরম সহ্য করতে হতো সেরকমই রাতের বেলায় প্রচন্ড ঠান্ডার। পরিশেষে ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারী তাঁকে জীবন্ত আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়। তাঁর বিচারকালীন ও মৃত্যুকালীন লেখা বেশ কিছু নথি থেকে এইটা পরিষ্কার হয় যে প্রকৃত সত্য অর্থাৎ বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর অগাধ বিশ্বাস ও নিষ্ঠা শেষ পর্যন্ত যায়নি। বিচার চলাকালীন চার্চের সকল যুক্তিকে তিনি বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ দিয়ে খণ্ডন করেন। তাঁকে পুড়িয়ে মারার আগে তাঁর জিভ কেটে নেওয়া হয় ও প্রচার করা হয় যে যারা তাঁকে অগ্নিদগ্ধ হতে দেখবে তারা সকল পাপ থেকে মুক্তি পাবে।

ব্রুনোর সারা জীবনের কর্মকান্ড ও অমানুষিক অত্যাচার সত্ত্বেও বিজ্ঞানের সঙ্গ ত্যাগ না করার জন্য তাঁকে অনেক সাহিত্যিক **"বিজ্ঞানের শহীদ"** আখ্যা দেন। ব্রুনো শুধুমাত্র জ্যোতির্বিজ্ঞানী বা দার্শনিক বা প্রতিবাদী নন, তিনি হলেন আপোষহীনতার এক মূর্ত প্রতীক। বর্তমানে যখন প্রতি মুহূর্তে আমরা আপোষের গড্ডালিকায় নিমজ্জিত হয়ে যাচ্ছি সেই সময়ে ব্রুনোর আপোষহীন মানসিকতা আমাদের আলোর দিশা দেখায়। প্রত্যেকদিন যখন অপবিজ্ঞানের করাল গ্রাস আমাদের গিলে খাচ্ছে তখন ব্রুনো আমাদেরকে দেখাচ্ছে মুক্তির পথ। ব্রুনো "বিজ্ঞান মনস্ক"-র কাছে তাই অনুপ্রেরণা। বর্তমান সময়েও বিজ্ঞান কর্মীদের অনেক প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হতে হয় বা ভবিষ্যতেও হবে, অবিজ্ঞান যখন তার কঙ্কালসার আঙ্গুল দিয়ে বিজ্ঞানের গলা টিপে হত্যার প্রচেষ্টায় রত তখন ব্রুনোই বিজ্ঞান মনস্ক মানুষকে প্রেরণা যোগাচ্ছে। অবিজ্ঞানের সেই জোয়ালকে চূর্ণ করার। তাই ব্রুনো হল বিজ্ঞান মনস্ক মানুষে আদর্শ। ব্রুনোর দেখানো আপাষহীন জীবনই বিজ্ঞান মনস্ক মানুষের কাছে অবিজ্ঞান, অপবিজ্ঞান বা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পাথেয়। তাই ব্রুনোর সেই বিখ্যাত উক্তি উদ্ধৃত করে বলতে ইচ্ছে হয় – **"আমি তোমাদের বিচারের জন্য যে পরিমাণ ভয় নিয়ে অপেক্ষা করে আছি তোমরা তার থেকেও অনেক বেশি ভীত হয়ে সেই বিচার দিলে আর একদিন সবাই সেই সত্যকে দেখতে পাবে যা আজকে আমি দেখছি।"** ■

প্রবন্ধ

"জল সংকট"-এর সামনে ও আড়ালে

শ্রেয়া চক্রবর্তী

জলের অপর নাম জীবন – একথা সকলেই জানে ও মানে। জীবন ধারণের জন্য এবং সভ্যতার অগ্রগতিতে জলের প্রয়োজন অপরিসীম। আধুনিক সভ্য মানুষের জলের প্রয়োজন হয় –

১) জলপান করা ও রান্না করার কাজে।

২) স্নান, জামা-কাপড় কাচা, ধোয়া-মোছা-পরিষ্কার করা, প্রাতঃকৃত্য সারার জন্য।

৩) কৃষিকার্যে, মৎসচাষে।

৪) ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্পে।

আমরা প্রায় সকলেই জানি পৃথিবীর তিনভাগ জল ও একভাগ স্থল। আবার পৃথিবীর মোট জলের ৩% হচ্ছে লবণমুক্ত মিষ্টিজল যা সঞ্চিত আছে সুউচ্চ পাহাড় ও মেরু অঞ্চলের বরফে, নদীপ্রবাহে, প্রাকৃতিক হ্রদ ও ভূগর্ভে। পৃথিবীর মোট মিষ্টি জলের ৭৫% ররফ রূপে, হিমবাহরূপে জমা আছে পাহাড়ের চূড়ায়, মেরু অঞ্চলে বা মেরুর নিকটবর্তী অঞ্চলে – বাকী ২৫% আছে নদী-নালায়, পুকুরে হ্রদে এবং ভূগর্ভে।

প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রগুলিতে চাহিদা অনুযায়ী জল সরবরাহের অভাব এবং পাঠ্যপুস্তক থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রচার মাধমের দৌলতে, "জল সংকট" শব্দ দুটির সাথে কম-বেশী সকলেই পরিচিত।

রাষ্ট্রসংঘ এবং আন্তর্জাতিক অর্থভান্ডারের মতে জল পুনঃনবীকরণ যোগ্য (renewable) সম্পদ নয়। এই সংস্থাগুলি এবং বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলি বলছে যে ভূগর্ভস্থ এবং মহাদেশীয় মিঠা জল উত্তোলন করে সরবরাহ করার জন্য যে প্রাকৃতিক শক্তি (কয়লা, পেট্রোলিয়াম বা নিউক্লিয় পরমাণু জ্বালিয়ে যে বিদ্যুৎ উৎপাদিত) ব্যবহৃত হয় তা যেহেতু একটি মানব সভ্যতার সময়সীমার মধ্যে পুনঃনবীকরনযোগ্য নয় তাই তারা একথা বলছে। তাই বলা হচ্ছে যে ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে পানযোগ্য জলের ভান্ডার নিঃশেষ হয়ে যাবে। একেই জল সংকট বলা হচ্ছে।

জল সংকটের কারণ হিসেবে বলা হয়েছে –

১) গভীর নলকূপ দ্বারা যথেচ্ছোভাবে জল তুলে নেওয়ার জন্য এবং আধুনিক কৃষি ব্যবস্থার ফলে মিঠা জলের স্তর নীচে নেমে যাচ্ছে।

২) রাষ্ট্র সংঘের মতে ক্রমাগত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে জলাধারের সংখ্যা কমে যাচ্ছে এবং পানীয় জলের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় পানীয় জল ভান্ডারে জলের পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে।

৩) গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর ফলে পাহাড়ের উপরে সঞ্চিত বরফ ও হিমবাহের অস্বাভাবিক গলনের ফলে পানযোগ্য জলের অনুপাত হ্রাস পাচ্ছে।

৪) কৃত্রিমভাবে জল দূষণ ব্যবহারযোগ্য জলের পরিমাণ হ্রাস করছে।

ভূ-পৃষ্ঠ ও বায়ুমন্ডলের বিভিন্ন স্তরের তাপমাত্রা যে পাল্লা এর মধ্যে থাকে তাতে জলের তিনটি ভৌতদশাই আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি। সমুদ্র-নদী-হ্রদ-জলাশয় (উন্মুক্ত জলাশয়) থেকে সূর্যরশ্মির অভাবে বাষ্পীভূত এবং ভূগর্ভস্থ জল বাষ্পমোচন (উদ্ভিদ দ্বারা) প্রক্রিয়ায় বাষ্প রূপে বায়ুমন্ডলে উপস্থিত হয়। ওই জলীয় বাষ্প বায়ুমন্ডলের স্তর ও অবস্থা অনুযায়ী (চাপ ও তাপমাত্রা) ঘনীভূত হয়ে মেঘ, কুয়াশায় পরিণত হয় এবং বৃষ্টি-তুষার-শিশির রূপে আবার ভূ-পৃষ্ঠে নেমে আসে। বায়ুমন্ডল থেকে ভূ-পৃষ্ঠে জলের গড় বার্ষিক অবতরণ হল ৮৫.৭ সেন্টিমিটার (৩৩.৮ ইঞ্চি)। পৃথিবীর উপরিভাগের বেশির ভাগ সমুদ্র দ্বারা আবৃত থাকায় বায়ুমন্ডল থেকে নেমে আসা জলের ৭৭% সমুদ্রে পতিত হয় এবং বাকী ২৩% মহাদেশীয় ভাগে পতিত হয়।

প্রাকৃতিক জলচক্র থেকে দেখা যাচ্ছে যে লবণযুক্ত সমুদ্রের বাষ্প থেকে বাষ্পীভূত হয়ে বাৎসরিক ৭ ইউনিট লবণমুক্ত জল মহাদেশের ভূপৃষ্ঠে যুক্ত হচ্ছে এবং মহাদেশগুলির ওপর আপতিত মিঠা জলের ৭ ইউনিট সমুদ্রে ফিরে এসে লবণযুক্ত

হচ্ছে।

এই প্রাকৃতিক পদ্ধতিই আমাদের শিখিয়ে দেয় যে, 'জল সংকট' এর সমাধানের অর্থাৎ পানীয় জলের ও ব্যবহার্য্য জলের ঘাটতি পূরণের প্রধান উপায় হল কৃত্রিমভাবে সমুদ্র জলের লবণমুক্ত করে বিশুদ্ধকরণ ঘটিয়ে সরবরাহ করা। এই কাজে যে প্রযুক্তিগুলি ইতিমধ্যে ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলি হল –

১) মাল্টি-ষ্টেজ ফ্লেস (MSF) ইভাপোরেশান।

২) রিভার্স অসমোসিস।

৩) লো টেম্পারেচার ইভাপোরেশান (LTE)। ভারতে বাণিজ্যিকভাবে এই প্রযুক্তিগুলিকে বিভিন্ন স্থানে প্রয়োগ করা হয়েছে। যেমন কিছু প্রকল্প হল –

a) 1990 সালে স্থাপিত 425 m^3/day MSF plant

b) 1999-এ মুম্বাই-এ (ট্রম্বে) স্থাপিত 100m^3/day Sea water reverse osmosis (SWRO) plant.

c) 2003 সালে রাজস্থানের যোধপুরে সাতলেন গ্রামে স্থাপিত 30 m^3/ day ক্ষমতা সম্পন্ন reverse osmosis প্রক্রিয়ায় গ্রামীণ জল প্রকল্প।

d) নিউক্লিয়ার ডি স্যালাইনেশন ডেমনস্ট্রেশন প্রজেক্ট (NDDP)–কালাপাক্কাম, তামিলনাডু। এটি 6300 m^3/day ক্ষমতা সম্পন্ন একটি বৃহৎ প্রকল্প।

মানবজীবনে ব্যবহৃত জলের অধিকাংশটারই রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটেনা। তাই ব্যবহৃত জল যৌগটি জল রূপেই থেকে যায় এবং প্রাকৃতিক জল চক্রেও যুক্ত হয়। বিভিন্ন খনিজ-পদার্থগুলি মানব সভ্যতার ব্যবহারের ফলে – ঐ পদার্থগুলির রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে (যেমন খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস) অথবা ঐগুলি থেকে উৎপন্ন বস্তু, স্থায়ীবস্তু রূপে (ধাতব পদার্থ– লোহা, তামার জিনিসপত্র, সোনা-রূপোর গহনা ইত্যাদি) থেকে যায়। কিন্তু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে জানা গেছে, প্রতিটি খনিজ (জৈব ও অজৈব) পদার্থ চক্রাকারে আবর্তিত হয়। বিভিন্ন পদার্থের এই চক্রাকারে আবর্তিত হওয়ার সময় সীমা বিভিন্ন যেমন কয়েক লক্ষ বছরের সৃষ্টি খনিজ তেল মাত্র কয়েক শত বছরে শেষ হতে চলেছে, কিন্তু তা বলে বর্তমানে ভূগর্ভে খনিজ তেল প্রস্তুতি প্রক্রিয়া চলছে না এমন নয় – বরঞ্চ চলছে অতি ধীর প্রক্রিয়ায়। মানবজীবন এবং এক একটি মানব সভ্যতার নিরিখে কোন কোন চক্র এর পর্যায়কাল ক্ষুদ্র আবার কোন কোন চক্র-এর পর্যায়কাল দীর্ঘ। যে পর্যায়গুলির চক্রাকার পর্যায়কাল দীর্ঘ তাদের ক্ষেত্রে, কোন একটি সভ্যতার সাপেক্ষে শেষ বা হ্রাস পাওয়ায় সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু জলের এই চক্রাকার আবর্তনের পর্যায়কাল অতিক্ষুদ্র। ফলে জলের ক্ষেত্রে নিঃশেষিত হওয়ার সম্ভাবনা একটি কল্পনামাত্র। সুতরাং "জল পুনঃনবীকরণ যোগ্য সম্পদ নয়"–বিশ্ব ব্যাঙ্ক ও আই এম এফ-এর এই বক্তব্য যে অর্থহীন তা নিশ্চয়ই বোঝা গেল। শুধু অর্থহীন নয় তা উদ্দেশ্য প্রণোদিতও বটে। আর এই উদ্দেশ্যকে সফল করতে বর্তমানে পেয় জলের উৎসগুলির ক্রমহ্রাসমান অবস্থাটা যে ভাবে প্রচার করা হচ্ছে – বিকল্প আবিষ্কারগুলিকে সরকারী উদ্যোগে সেভাবে প্রচার বা কার্যকরী করা হচ্ছে না। তাই মানুষের কাছে **"জল সংকট"** সৃষ্টি করেছে **"জলাতঙ্ক"**।

"জল সংকট" শব্দ দুটি হাজির করার উদ্দেশ্য হল **"জলের দরে"** শব্দ দুটির বিলোপ ঘটানো। জল-বায়ু-সূর্যালোক এই প্রাকৃতিক সম্পদগুলি মানুষের জীবন ধারণের জন্য অপরিহার্য্য। কিন্তু এই প্রাকৃতিক সম্পদগুলি যুগ যুগ ধরে বিনিময় মূল্য ছাড়াই মানুষ ব্যবহার করে এসেছে। "জল-সংকট" আওয়াজকে সামনে রেখে পানীয় জলের ভান্ডারের নিঃশেষ হওয়ার আতঙ্ক মানুষের মনে সৃষ্টি করতে না পারলে, জল নামক প্রাকৃতিক সম্পদটির ওপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করা যাবে না। যে সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করা যায় না – তার বাজার সৃষ্টি করে মুনাফা লোটা যায় না। "জল-সংকট" সাইন বোর্ডের আড়ালে আছে "জল"-কে পণ্য রূপে বাজারে হাজির করা এবং জল দূষণের হাত থেকে রক্ষা পেতে ব্যক্তিগতভাবে জল আর পরিশ্রুতকরণ যন্ত্রপাতি কেনার বাজার সৃষ্টি করা। জল বিক্রিকারী কোম্পানীগুলি দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে গড়ে ২৫ পয়সা/লি. দরে জল সংগ্রহ করে ১০-১২ টাকা / লিঃ দরে বিক্রি করে, যদিও তা কতটা পরিশুদ্ধ সে ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। Emico-water-Technologies Ltd-এর ডিরেক্টর এইচ ত্রিবেদী-র মতে ভারতে প্রতি বছর সম্ভাব্য জল ব্যবসার পরিমাণ হতে পারে ন্যূনতম ১ বিলিয়ন ডলার বা ৪৮৭০ কোটি টাকা। যার এক-তৃতীয়াংশ জল সংক্রান্ত প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি আমদানী ও উৎপাদনে খরচ হবে।

ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক জল দূষণ সৃষ্টিকারী শিল্প-কারখানাগুলিকে সবচেয়ে বেশি লগ্নি সাহায্য করেছে এই ভারতবর্ষে এবং মজার ব্যাপার ঐ সব অঞ্চলগুলিতেই জল পরিশুদ্ধিকরণ প্রজেক্টগুলিতেও পুঁজি লগ্নী করেছে, যে পরিশ্রুত পানীয় জলের বেশির ভাগই বে-সরকারী মাধ্যমে জনসাধারণকে পয়সা দিয়ে কিনে খেতে হবে। জাতি সংঘ ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছে**জল মানুষের মৌলিক চাহিদা – মৌলিক অধিকার নয়,** যা ভারত রাষ্ট্র মেনে নিয়েছে। চাহিদা থাকলেই বাজার সচল থাকে – তাই জলের বাজারকে সচল রাখতে রাষ্ট্র সংঘের এই ঘোষণা।■

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ইতিহাস

ঘড়ি আবিষ্কারের ইতিহাস

উৎপল ভট্টাচার্য্য

সময় আমাদের জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর। এই সময়কে মাপতে মানুষ সভ্যতার শুরু থেকে নানা উপায় উদ্ভাবন করেছে। তারই ফলে বিভিন্ন যুগে তৈরী হয়েছে নানারকম ঘড়ি। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই ঘড়ি পরিবর্তিত হয়েছে – যার পরিণতি আধুনিক ঘড়ি।

প্রাচীনকালে মানুষ অমাবস্যা, পূর্ণিমা, সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত, আকাশের অন্যান্য তারার অবস্থান দেখে কাজকর্ম করতেন। এছাড়া চারপাশের বিভিন্ন ঘটনা থেকে তারা সময় ঠিক করতেন।

খ্রীস্টপূর্ব ৩০০০ অব্দ নাগাদ মিশরীয়রা এবং ব্যাবিলনের লোকেরা সূর্যের আলোকে কাজে লাগিয়ে সময় গণনা করতেন। তারাই প্রথম ঘন্টাকে ৬০ মিনিটে এবং মিনিটকে ৬০ সেকেন্ডে ভাগ করেন। তাদের তৈরী করা ঘড়ি সূর্য ঘড়ি, ছায়া ঘড়ি, শঙ্কু পট নামেও পরিচিত ছিল। মিশরীয়রা লক্ষ্য করতেন। ফাঁকা জায়গায় একটা লাঠি পুঁতে রাখলে সকালে এর ছায়া লম্বভাবে পড়ে ও বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই ছায়ার দৈর্ঘ্য ক্রমশ কমে ও একটা সময় এটি আর থাকে না। আবার সূর্যাস্তের সময় সর্বাধিক লম্বা হয়। এই ঘটনাকে কাজে লাগিয়ে লাঠির ছায়ার দৈর্ঘ্যের সীমানা বরাবর কেটে রাখা দাগ দেখে তারা সময়ের হিসাব রাখতে শুরু করেন। ব্যাবিলনের লোকেরাও একইভাবে সময়ের হিসাব রাখতেন। পরবর্তীকালে সুবিধামত অনুভূমিক ও বৃত্তাকার পাটাতনের উপর সময় নির্দেশক দাগ এঁকে এবং তার ওপর ত্রিভুজাকার অস্বচ্ছ বস্তু খাড়াভাবে যুক্ত করে সূর্যঘড়ি তৈরি হয়েছে। এই ঘড়িতে ত্রিভুজাকার ফলকটি ধ্রুবতারার দিক বরাবর বসানো হত বলে সব ঋতুতে একই সময় পাওয়া যেত। প্রাচীনতম সূর্যঘড়ি খ্রী: পূ: ১৫০০ শতাব্দীতে মিশরে তৈরী হয়েছিল। এছাড়াও সেই সহস্রাব্দে ব্যাবিলন, গ্রীস ও রোমে সূর্যঘড়ির প্রচলন ছিল। 'সূর্যসিদ্ধান্ত' ও 'নিদানসূত্র' থেকে জানা যায় যে ভারতবর্ষে বৈদিকযুগে সূর্যঘড়ির ব্যবহার ছিল। আর্কিমিডিসের চেয়ে প্রায় ২৩ বছর আগে অ্যারিস্টার্কাস একটি উন্নতমানের সূর্যঘড়ি তৈরী করেন। এর দ্বারা আরো নিখুঁতভাবে সময় নির্ণয় করা যেত। ইংল্যান্ডে স্যাক্সনদের রাজত্বে পকেট সূর্যঘড়ি ব্যাবহার হত।

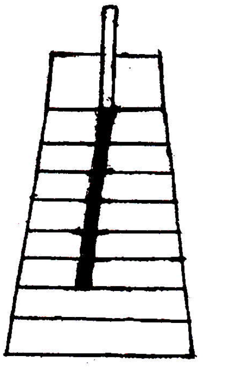

ব্যাবিলনের ছায়াকাঠি

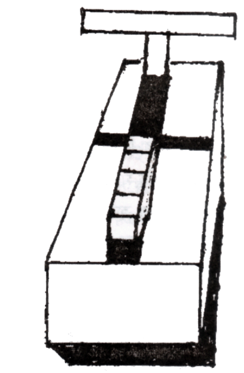

মিশরের ছায়াঘড়ি

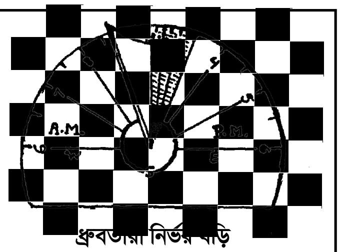

ধ্রুবতারা নির্ভর ঘড়ি

পরবর্তীকালে মিশরে তৈরী হয় জলঘড়ি। এরপর এই জলঘড়ি প্রাচীন গ্রীস ও রোমে ছড়িয়ে পড়ে। একটা পাত্রে জল ভরা থাকত ও এর তলায় থাকত ফুটো। এই ফুটো দিয়ে জল ফোঁটায় ফোঁটায় পড়তো। সেই পাত্রের ভেতরে দাগ কাটা থাকত এবং জলের তল কোন দাগ ছুঁয়ে আছে তা দেখে সময় জানা যেত। বিভিন্ন কায়দায় সেসময় জলঘড়ি ব্যবহার হত। মালয় দেশের নাবিকরা নারকোলের অর্ধাংশের নীচে ছোট

ঘড়ি আবিষ্কারের ইতিহাস

ছোট ফুটো করে তাকে বিশেষ কায়দায় জলপূর্ণ পাত্রে বসিয়ে দিতেন। খোলের ফুটো দিয়ে ঢুকে আসা জলের তল দেখে সময় জানা যেত। মিশরে কায়রো যাদুঘরে রাজা তৃতীয় আমেনহোটেপ-এর আমলের একটি প্রাচীন জলঘড়ি রাখা আছে। বিশ্বের সবচেয়ে ভারী যন্ত্রচালিত জলঘড়ি হল ক্যাং-ফেং-এর তৈরী সুসুং ঘড়ি। ১০৪৪ খ্রীঃ চিন সম্রাট সুং-সুং তাঁর রচিত বই ‘সিন আই সিয়াং ফা ইয়াও’তে ছবি সহ ঘড়িটির

মিশরের জলঘড়ি

বিবরণ দিয়েছেন।

প্রাচীনকালে একটি কাঁচপাত্র থেকে আর একটি কাঁচপাত্রে বালি পড়তে যে সময় লাগত তা দেখে সময় নির্ণয় করা হত। দুটি কাঁচের বোতলকে মুখোমুখি জুড়ে দেওয়া হত। ওপরের বোতলে রাখা পরিষ্কার শুকনো বালি ঝুর ঝুর করে নীচের বোতলে পড়ত। নীচের বোতল খালি থেকে পূর্ণ হওয়ার সময়কে একক হিসেবে ধরা হত। পূর্ণ হয়ে গেলে পুরো

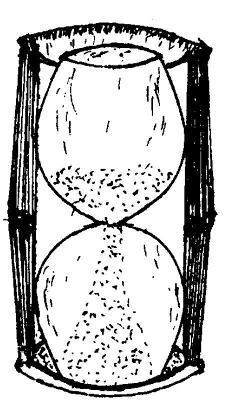

বালি ঘড়ি

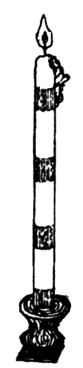

বাতি ঘড়ি

ব্যবস্থাটিকে উল্টে দেওয়া হত।

ইংল্যান্ডের রাজা অ্যালফ্রেড বাতি ঘড়ি ব্যবহার করতেন। কতগুলি সমান আকারের মোমবাতির গায়ে কয়েকটি দাগ কাটা থাকত। একটি দাগ থেকে আরেকটি পর্যন্ত পুড়তে যে সময় লাগত তা হল ১ ঘন্টা। বাতি জ্বলার হার দেখে সময় মাপা হত বলে একে আগুন ঘড়িও বলা হত।

ইংরেজিতে ‘ক্লক’ (Clock) শব্দটি ফরাসি শব্দ ‘ক্লোশ’ থেকে এসেছে, যার অর্থ ‘ঘন্টা’। ঘন্টা বাজানোর রেওয়াজ চালু ছিল বলে সেসময় (খ্রীঃ পরবর্তী প্রথম সহস্রাব্দে) ঘড়ি বলতে ঘন্টাকে বোঝানো হত। পরবর্তীকালে যান্ত্রিক ঘড়ি আবিষ্কৃত হয়েছিল। তুলাদন্ড, দাঁতাল চাকা, ঘন্টার কাঁটা প্রভৃতি ব্যবহার করে এইসব যান্ত্রিক ঘড়ি তৈরী হত। ১২৩২-১৩৪০ খ্রীঃ পর্যন্ত ব্যবহৃত প্রায় ২০টি যান্ত্রিক ঘড়ির বিশদ বিবরণ ঐতিহাসিকেরা উদ্ধার করেছেন। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মান, সুইজারল্যান্ড প্রভৃতি দেশে এরকম ঘড়ি তৈরী হত। ১৩৩৫ খ্রীষ্টাব্দে তৈরী একটি ভার চালিত ঘড়ি সমারসেট ওয়েলস গীর্জায় লাগানো হয়। বর্তমানেও সেই ঘড়ি সমারসেট ওয়ালস গীর্জায় আছে।

১৪১০ খ্রীষ্টাব্দে ইতালীয় স্থপতি ফিলিপো ব্রুনেলেশ্চি প্রথম গোটানো স্প্রিংকে ঘড়িতে ব্যবহার করেন। ১৫০২ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানির কারিগর পিটার হেনলি স্প্রিং-এর প্যাচ খোলাকে কাজে লাগিয়ে একটি ঘড়ি তৈরি করেন – যা ছিল আধুনিক পকেট-ঘড়ি, হাত-ঘড়ির প্রথম পদক্ষেপ। সপ্তদশ শতাব্দীতে গ্যালিলিও দোলক আবিষ্কার করেন যার ফলে সময় গণনার ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটে যায়। ১৫৮২ সালে গ্যালিলিও দোলকের সমান সময় রক্ষণ ক্ষমতা আবিষ্কার করেন।

১৮ বছর বয়সে তিনি দোলকের সূত্র আর সময় হিসাবের জন্য দোলকের ব্যবহার পদ্ধতি ব্যবহার করেন। জার্মানির দি হেগে ১৬৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ডিসেম্বরে আবিষ্কার করেন প্রথম সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত দোলক-ঘড়ি। ১৬৭০ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ ঘড়ি নির্মাতা উইলিয়াম ক্লিসেন্ট সেকেন্ড দোলক প্রবর্তন করেন। পরবর্তীকালে জর্জ গ্রাহাম এক ধরণের পারদ-দোলক আবিষ্কার করেন যা দোলক ঘড়িতে উন্নততর ব্যবস্থা নিয়ে আসে। প্রায় একই সময় জন হ্যারিসন ‘গ্রিড-আয়রন দোলক’ আবিষ্কার করেন। পকেটঘড়ি, হাতঘড়ি, টেবিল ঘড়ি, দেওয়াল ঘড়ি প্রভৃতির ব্যবহার আজও ব্যাপক পরিমাণে আছে যার সূত্রপাত সেই সময়ে হয়।

পরবর্তীকালে বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ঘড়ি তৈরিতেও বৈচিত্র এসে পড়ে। বিভিন্ন ইলেকট্রিক ঘড়ি

রিপোর্ট

খাদ্যে ভেজাল – একটি সেমিনার

গত ৬ই ডিসেম্বর, ২০১০ বিজ্ঞান মনস্ক সোনারপুর শাখার পরিচালনায় একটি সেমিনার-এর আয়োজন করা হয়। সেমিনারের বিষয় ছিল 'খাদ্যে ভেজাল'। সোনারপুর কামরাবাদ উচ্চ বিদ্যালয়ে বিকেল ৩.৩০ মি.-এ অনুষ্ঠানটি শুরু হয়। অনুষ্ঠানে প্রায় ৫০-৬০ জন দর্শক উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান শুরু হয় উদ্বোধনী সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে। বিজ্ঞান মনস্কের তরফ থেকে অনুষ্ঠানের সঞ্চালক রামপ্রবেশ সাউ প্রস্তাবনা পাঠ করেন যাতে বিজ্ঞান কি, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী বলতে কি বোঝায় এবং বিজ্ঞান মনস্কের সামাজিক দায়বদ্ধতার বিষয়টি তুলে ধরা হয়। এরপর বিজ্ঞান মনস্ক'র সদস্যা নন্দা মুখার্জী সাম্প্রতিক গণ হিস্টিরিয়া (চলতি কথায় ডিস্কো রোগ) সম্বন্ধে বিজ্ঞান মনস্কের দৃষ্টিভঙ্গী এবং ঐ বিষয়ে বিজ্ঞান মনস্কের জনগণের মধ্যে গণচেতনা সৃষ্টির উদ্যোগ এবং তার অভিজ্ঞতা নিয়ে দু'চার কথা বলেন এবং উপস্থিত শ্রোতাদের এই সকল গণসচেতনতা সৃষ্টির কার্যক্রমে বিজ্ঞান মনস্কের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন। এরপর শিশু শিল্পী সুজান বসু, অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ অন্যরূপ রচিত 'ভেজাল এবং ভেজাল' কবিতাটি সুন্দরভাবে আবৃত্তি করে। তারপর শ্রী শৈলেন নাথ দুটি সঙ্গীত 'মাটিতে জন্ম নিলাম মাটি তাই রক্তে মিশেছে' ও কাজি নজরুল ইসলামের 'অন্তর ন্যাশনাল' পরিবেশন করেন যা খুবই মনজ্ঞ ছিল। এরপর আর এক শিশু শিল্পী বর্ষিণী দাস সুকান্ত ভট্টাচার্য্যের 'ভেজাল' কবিতাটি পরিবেশন করে। তন্ময় মাহাতো কুমুদ হালদার রচিত 'পালস্ পোলিও' কবিতাটি আবৃত্তি করেন।

এরপর শুর হয় মূল অনুষ্ঠান। সেমিনার ভেজাল-এর ক্ষতিকারক দিক ও গণ সচেতনতার দিক। এই পর্বে ভেজাল কি, তার ক্ষতিকর দিকগুলি কি কি রয়েছে তা বিস্তারিতভাবে ব্যক্ত করা হয়। খোলা বাজারে আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য যেমন, দুধ, তেল, চা, রঙ্গীন মিষ্টি, কাঁচা শাক-সব্জী ইত্যাদিতে ভেজালের উপস্থিতি কিভাবে বোঝা যাবে তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে উপস্থিত দর্শকদের কাছে নিবেদন করা হয়। ভেজালকারীরা কেন খাদ্যে ভেজাল দেন, ভেজালকারীরাও যে ভেজাল খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করতে বাধ্য তা বক্তাদের বক্তব্য থেকে পরিষ্কার হয়। একজন ব্যক্তি এককভাবে যে এই ভেজালের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারেনা বরং এই লড়াই সমগ্র জাতীর লড়াই তা অনুষ্ঠানে প্রতীয়মান হয় । তিনি বলেন "ভেজালের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ব্যক্তিগতভাবে নিজেদের বাড়িতে ল্যাবরেটরী বানিয়ে টেস্ট করে খাদ্যসামগ্রী গ্রহণ করা বা ভেজালদারকে মারধোর দিয়ে ভেজাল বন্ধ করার চেষ্টা কোনটাই বাস্তবসম্মত নয়। ভেজাল খেয়ে অসুস্থ হলে সরকারী আইন অনুযায়ী আদালতে গিয়ে ভেজালদারের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়ের নিয়ম আছে। ১৯৮৮-৮৯ সালে বেহালায় ভেজাল সরষে তেল খেয়ে যারা পঙ্গু হয়েছেন তাদের বর্তমান অবস্থা অবশ্যই জানা আছে। তাই আমরা নিছক কাজীর বিচার চাই না। শুধু ক্ষতিপূরণের দাবী নয়, ক্ষতি না হওয়ার ব্যবস্থা নেওয়ার দাবী করছি। তাই ভেজাল রোধ করার জন্য সরকারী দপ্তরের মাধ্যমে সক্রিয় পদক্ষেপ নেওয়ানোর জন্য সমগ্র সচেতন মানুষকে ঐক্যবদ্ধভাবে সরকারকে জানান দিতে হবে।" সেমিনারটি পরিচালনা করেন পঞ্চানন মন্ডল, শিশির কর্মকার ও রামপ্রবেশ সাউ।

সর্বশেষে অন্যরূপ রচিত 'ভেজালের জালে' নাটকটি মূল অনুষ্ঠানের সাথে খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। নাটিকাটিতে অংশগ্রহণ করেন কেয়া কর্মকার, মৃদুল হাউলি, শিশির কর্মকার ও কেকা মন্ডল। অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণে একটি বিজ্ঞান বিষয়ক পোষ্টার প্রদর্শনী ও একটি বইয়ের ষ্টলও ছিল। ■

● *ঘড়ি আবিষ্কারের ইতিহাস*

আবিষ্কৃত হয়। ১৯৩০ খ্রী: কম্বোডিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী আইসিডোর রবি (Isidor Rabi) গবেষণা করে পারমাণবিক ঘড়ি তৈরির ভিত্তি বার করেন। ১৯৬৭ সালে 'জেনারেল কনফারেন্স অন ওয়েটস অ্যান্ড মেজারস'-এ সিজিয়াম পরমাণু ঘড়ি নির্ণীত পারমাণবিক সেকেন্ডকে একক হিসাবে গ্রহণ করার হয়। সেখানে জানানো হয় ৯,১৯২,৬৩১,৭৭০ বার ঘূর্ণনে সিজিয়াম পরমাণুর ইলেকট্রনের যে সময় লাগে, তাকে পারমাণবিক সেকেন্ড বলে। ১৯৭২ সালে পয়লা জানুয়ারি থেকে প্যারিসে চালু হয় 'Co-Ordinated Universal Time' সংক্ষেপে UTC। ■

গ্লোবাল ওয়ার্মিং প্রসঙ্গে

বিশ্বরূপ

বিগত কয়েক দশক ধরে "বিশ্ব উষ্ণায়ন" আওয়াজে গ্রাম থেকে শহর, দেশ থেকে বিদেশ, পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তের মানুষ চিন্তিত। রাষ্ট্রসংঘের বিজ্ঞানীদের সংগঠন IPCC প্রতিবছর বিশ্ব পরিবেশ সম্পর্কিত সম্মেলনে উপস্থিত হয় এবং সম্মেলন শেষে নতুন নতুন তথ্য হাজির করে। এই সম্মেলনগুলিতে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র প্রধানরাও উপস্থিত থাকে। এই সমস্ত তথ্য মারফৎ বিশ্বের মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য সংবাদমাধ্যম ছাড়াও প্রতিটি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় নিম্ন শ্রেণী থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্তও প্রতিটি শাখায় 'পরিবেশ বিদ্যা' নামক subject-কে অবশ্যকীয় রূপে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও যে যে সাবজেক্ট এ সম্ভব হয়েছে – তার মধ্যেও বিশ্ব উষ্ণায়ন ও গ্রীন হাউস গ্যাস এফেক্ট বিষয়টি নিয়ে আসা হয়েছে।

বিশ্ব উষ্ণায়ন বলতে বোঝানো হয়েছে - এই পৃথিবীর স্থলভাগ, জলভাগ এবং তৎসংলগ্ন বায়ুমন্ডলের উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। যারা "গ্লোবাল ওয়ার্মিং"-এর তত্ত্বকে হাজির করেছেন তাদের মতে –

বায়ুমন্ডলে CO_2, CH_4, NO, CFC প্রভৃতি গ্যাসগুলির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে – আর এই গ্যাসগুলির যেহেতু গ্রীন হাউস থেকেই হয়েছে এবং এদের তাপ ধারণ ক্ষমতার বেশী, তাই সূর্য থেকে স্থলপৃষ্টে আসা তাপশক্তির বেশ কিছুটা এই গ্যাসগুলি পরিবেশের মধ্যে ধরে রাখে। ফলে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। আর এই গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য জলবায়ুর পরিবর্তন হচ্ছে এবং হবে। যার ফলস্বরূপ –

(১) কোথাও বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেড়েছে ও বাড়বে, আবার কোথাও বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমেছে ও কমবে। বন্যা-খরা ঘটছে ও ঘটবে – কৃষি উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে ও পাবে – খাদ্যের অভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে ও পাবে – সার বিশ্বজুড়ে **দারিদ্র** চরম সীমায় পৌঁছাবে।

(২) হিমবাহগুলির গলন শুরু হয়েছে। IPCC এর এক রিপোর্টে বলা হয়েছে ভারতের হিমালয়ের হিমবাহগুলির ২০৩৫ সালের মধ্যে গলে শেষ হয়ে যাবে – ফলে হিমালয় থেকে উৎপন্ন বরফগলা জল পুষ্ট নদীগুলিতে প্রথমে জলের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে এবং শেষ পর্যন্ত জলের অভাবে শুকিয়ে যাবে।

(৩) সমুদ্রের জলতল বৃদ্ধি পাবে – ফলে উপকূলবর্তী নীচু অঞ্চলগুলিতে সমুদ্রের তলায় চলে যাবে। বহুমানুষ ও সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

(৪) গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর জন্য প্রাকৃতিক বিপর্যয় হয়ে যাচ্ছে ফলে মানব জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

এইরকম গ্লোবাল ওয়ার্মিং তত্ত্বের ফেরিওয়ালাদের মতে, এর জন্য দায়ী বায়ুমন্ডলে গ্রীন হাউস গ্যাস-এর বৃদ্ধি। আর এই গ্যাসগুলির পরিবেশে বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ –

(ক) যন্ত্রচালিত শিল্পের বিকাশ

(খ) পরিবহন শিল্প ও শক্তি উৎপাদন ক্ষেত্রে ফসিলফুয়েল ব্যবহার

(গ) শিল্প স্থাপনের জন্য বিস্তীর্ণ বনভূমি কেটে ফেলা

(ঘ) খনিজ-পদার্থ উত্তোলন।

একদিকে কারখানা, পরিবহন ব্যবস্থা ও শক্তি উৎপাদনে ক্ষেত্রগুলি পরিবেশে গ্রীন হাউস গ্যাস নির্গমন বৃদ্ধি করছে, অন্যদিকে বনভূমি কমে যাওয়ায় উদ্ভিদ দ্বারা CO_2 শোষণ হ্রাস পেয়েছে। এনজিও-দের থেকে প্রকৃতির উপর মানুষের হস্তক্ষেপই গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর মূল কারণ।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে দু-চারটি তথ্য আমাদের মধ্যে "গ্লোবাল ওয়ার্মিং" বিষয় সম্পর্কে জানার আগ্রহ বাড়িয়ে দেয়। তথ্যগুলি হল –

(১) IPCC-এর সভাপতি রাজেন্দ্র পাচৌরির বক্তব্য অনুযায়ী বিশ্ব-উষ্ণায়নে, ভারতের হিমালয়ের হিমবাহগুলি ২০৩৫ সালের মধ্যে গলে শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু পরবর্তীতে রাজেন্দ্র পাচৌরি স্বীকার করে নেন যে একটি এনজিও দ্বারা প্রকাশিত New-Scientist পত্রিকা-কে ভিত্তি করে তার এই বক্তব্য – যার বৈজ্ঞানিক সত্যতা জানা নাই।

(২) IPCC -এর রিপোর্ট-এ যখন বলা হচ্ছে - বিশ্ব উষ্ণায়নের জন্য বাংলা দেশের ২০% ডুবে যাবে, অথচ

তখনই বাংলাদেশের সরকারী গবেষণা প্রতিষ্ঠান জানাচ্ছে যে, পলি পড়ে বাংলাদেশের প্রতি বছর বহু বর্গ কিমি জমি বেড়ে যাচ্ছে।

(৩) পশ্চিমবঙ্গের গঙ্গার মোহনায় - দীর্ঘদিন ধরে ক্ষয়প্রাপ্ত "ঘোরামারা" দ্বীপের অবস্থানকে দেখিয়ে, বিশ্ব উষ্ণায়নের তথ্যচিত্র বানিয়েছে একটি এনজিও। কিন্তু "ঘোরামারার" ঠিক পাশেই অবস্থিত নয়াচর দ্বীপ গত দশকে অনেকটা আকারে বেড়েছে। সন্দেহের অবসান ঘটানোর জন্য - আমরা "বিজ্ঞান মনস্কের" পক্ষ থেকে, "বিশ্ব উষ্ণায়নের" কারণ জানার জন্য বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সহায়তাগুলি জানার চেষ্টা করি।

আমরা যা জানলাম –

পৃথিবীর তাপমাত্রা পরিবর্তনের প্রধান কারণগুলি –

১) জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক (Astronomical) কারণ সমূহ জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতে পৃথিবীর তাপমাত্রা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে তাপের উৎস সূর্য থেকে বিকিরিত তাপের পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধি এবং সূর্য্য ও পৃথিবীর দূরত্বের পরিবর্তনই এর জন্য প্রধানভাবে দায়ী। যে চক্রগুলির দ্বারা এই তাপ আসা নিয়ন্ত্রিত হয় সেগুলি হল–

(ক) ১১ বছর ও ২০৬ বছরের চক্রগুলির সৌরশক্তি নির্গমনের পরিবর্তনের চক্রগুলি (সান স্টার্ট)

(খ) ২১,০০০ বছরের চক্র ঃ সূর্যকে ঘিরে প্রদক্ষিণরত পৃথিবীর আসা এবং উপবৃত্তাকার কক্ষপথের পরিবর্তনের চক্রগুলি

(গ) ৪১,৮০০ বছরের চক্র ঃ পৃথিবীর কক্ষপথের (কক্ষতলের) পরিবর্তন (আই-১.৫° চক্র)

(ঘ) ১৮০,৮৮০ বছরের চক্র ঃ পৃথিবীর উপবৃত্তাকার কক্ষপথের দৈর্ঘ্যের পরিবর্তনের চক্র

(২) বায়ুমন্ডলের উপাদানগুলির পরিবর্তন জনিত কারণসমূহ–

(ক) তাপধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি ঃ বায়ুমন্ডলের গ্যাসগুলির মধ্যে প্রধানতঃ জলীয়বাষ্প (জলকণা নয়) এবং অবশ্য গ্যাসগুলি যেমন মিথেন, কার্বন ডাই অক্সাইড, নাইট্রস অক্সাইড, ক্লোরো ফ্লুরো কার্বন – গ্যাসগুলির গ্রীন হাউস গ্যাস থেকে পৃথিবীর গড় উষ্ণতা বৃদ্ধি করে। বৈজ্ঞানিকদের মতে, গ্রীন হাউস এফেক্ট পৃথিবী পৃষ্ঠকে ৩৩° সেন্টিগ্রেট উত্তপ্ত রেখেছে। অর্থাৎ গ্রীন হাউস এফেক্ট না থাকলে পৃথিবীর গড় উষ্ণতা হত - ১৮° সেন্টিগ্রেট। যা জীবের আবির্ভাবের সম্ভাবনাকেই নামিয়ে দেয়। তাই বিজ্ঞানীরা বায়ুমন্ডলে এই গ্যাসগুলির উপস্থিতিকে আশীর্বাদ মনে করেন, অভিশাপ নয়।

(খ) সৌর বিকিরণের প্রতিফলজনিত কারণ ঃ সাদা মেঘ, আগ্নুৎপাতজনিত ধূলিকণা, মেরুঅঞ্চল এবং হিমালয়-আল্পসের মত পাহাড়ের মাথার বরফ সুল থেকে আসা আলোকরশ্মির একটা অংশকে প্রতিস্থাপিত করে ফিরিয়ে দেয়। এর ফলে সূর্য থেকে যত পরিমাণ তাপমাত্রা এসে পৃথিবীকে উত্তপ্ত করার কথা তার চেয়ে পৃথিবী কম উত্তপ্ত হয়।

(৩) ভূ-তাত্ত্বিক (Plate Tectonic) কারণসমূহ –

(ক) পৃথিবী পৃষ্টের উপরিতলে সমুদ্র, মহাদেশ বা আংশিক সমুদ্র-অংশের মহাদেশ নিয়ে যে লিথোস্ফিয়ারিক গতির জন্য একে অপরের তুলনায় সরে সরে যায়। বিভিন্ন মহাদেশগুলির অবস্থান বছরে কয়েক মিলিমিটার সরে যায়। এর ফলে মহাদেশগুলির ভৌগলিক অবস্থান বদলায়। ফলে জলবায়ুও সময়ের সাথে সাথে পাল্টায়। যেমন ভারতসহ এই উপমহাদেশে প্রায় ২০ কোটি বছরে দক্ষিণ মেরুর সন্নিকট থেকে নিরক্ষরেখার পার হয়ে বর্তমানে উত্তর গোলার্ধে (২৩° অক্ষাংশে) অবস্থিত।

(খ) সামুদ্রিক প্লেটগুলির বিস্তারের ফলে সমুদ্রতল ও জলের গভীরতা পাল্টায়। সমুদ্রের জলতল কতটা দৈর্ঘ্য বা কতটা নামবে তার জন্য এটাই প্রধান কারণ।

এ বিষয়ে আরো জানার চেষ্টা করে আমরা যা পেলাম তা হল–

বৈজ্ঞানিকরা ৮ লক্ষ বছরের, পৃথিবীর ইতিহাস খেটে দেখেছেন যে, প্রতি একক্ষ বছর অন্তর পৃথিবীতে বরফযুগ এসেছে। প্রথমে পৃথিবী নিজেই উত্তপ্ত ছিল এবং তাপ বিকিরণের মধ্যে যে ক্রমশ শীতল হয়। আজ থেকে প্রায় ২৪০ কোটি বছর পূর্বে পৃথিবীতে প্রথম বরফ যুগের আবির্ভাব। তারপর থেকে পর্যায়ক্রমে পৃথিবী শীতল ও উষ্ণ হয়েছে। দুটি প্রধান বরফ যুগের মধ্যবর্তী সময় শুধুই উষ্ণ যুগ চলে এরকম নয়। মধ্যবর্তী সময় ছোট ছোট শীতল যুগ ও ছোট ছোট উষ্ণ যুগ চলে।

বিগত কয়েকশত বছরের মত গৃহীত তথ্য থেকে পৃথিবীর তাপমাত্রা ও পৃথিবীর ইতিহাস এর সঙ্গে বিশ্ব উষ্ণায়ণের বৈজ্ঞানিক কারণের মিল পাওয়ার কারণে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, গ্লোবাল ওয়ার্মিং একটি প্রাকৃতিক ঘটনা। এই সিদ্ধান্তে আমরা আরো দৃঢ় হই যখন জানতে পারি যে, গ্রীন হাউস এফেক্ট-এর ০.২৮% এর জন্য দায়ী মানব সভ্যতার বিকাশ ও ফসিল ফুয়েলের ব্যবহার এবং গ্রীন হাউস এফেক্টের

●২৩ *পৃষ্ঠায় দেখুন* ➔

সমীক্ষা

গণ হিস্টিরিয়া এবং কেন ?

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশ থেকে শুরু করে ধাপে ধাপে দক্ষিন বঙ্গের প্রায় প্রতিটি জেলার উপর দিয়ে এক “অজ্ঞতার অভিশাপ” প্রবাহিত হয়েছে। যার কম্পাংক শহর থেকে গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ মানুষ কম্পিত। এই রোগটির স্থান ভেদে বিভিন্ন নাম আছে। যেমন ঝিনঝিনে রোগ, ডিস্কো রোগ, কচ্ছপ রোগ।

চিকিৎসা শাস্ত্রে এর নাম দেওয়া হয়েছে - কোরো সিড্রোম। এই রোগের বৈশিষ্ট্য হল - পুরুষদের যৌনাঙ্গ ছোট হতে হতে ভেতরে ঢুকে যাওয়া, মহিলাদের স্তন ছোট হতে হতে শেষ হয়ে যাওয়া। ইউরোপ, আমেরিকায় এর নাম জেনিটাল রিট্রাকশন সিন্ডোম। চীনে এর নাম ‘সুক ইয়াঙ্ক’।

মানুষের শরীর বিদ্যা পরিষ্কারভাবে বলা আছে - মানুষের জন্মের সময় যে অঙ্গগুলি বাহিরে থাকে - তা কোন অবস্থাতেই ভিতরে ঢুকে যেতে পারে না। কারণ বাহিরের অঙ্গগুলি বিশেষ প্রয়োজনেই বাহিরে অবস্থান করে এবং শরীরের ভিতরে ঢুকে যাবার মত স্থানও থাকে না।

পুঁথিগত শিক্ষায় শিক্ষিত এবং পুঁথিগত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত প্রতিটি মানুষই তাদের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে জানেন যে পুরুষের যৌনাঙ্গে সংকোচন-প্রসারন একটি অতি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। ঠান্ডা এবং টেনশনে পুরুষাঙ্গ সঙ্কোচিত হওয়ার ঘটনা প্রায় প্রত্যেক পুরুষই প্রত্যক্ষ করেছেন। মহিলাদের periods এবং আগে-পরে, মেনোপোসের সময় এবং গর্ভাবস্থায় বেশ কিছু ঘটনা ঘটে যা সকল মহিলা ও ডাক্তাররা জানেন। পুরুষ ও মহিলাদের এই সব শরীর বৃত্তীয় ঘটনা খুবই স্বাভাবিক। তা বলো কোন অবস্থাতেই কারোরই কোন যৌনাঙ্গ শরীরের ভিতরে ঢুকে যেতে পারে না। এই বিজ্ঞানটি না জানার কারণে কোন ব্যক্তি রোগটা হচ্ছে শুনেই - নিজে আক্রান্ত হয়েছে। যা প্রমাণ করে এটা কোন রোগ নয় - গুজব দ্বারা প্রভাবিত। আর এই রোগের প্রতিকার রূপে ছড়িয়ে পড়েছে - আক্রান্ত ব্যক্তিকে বাধ্যতামূলক ভাবে নিম্নাঙ্গ ঘন্টা পর ঘন্টা জলে ডুবিয়ে রাখা, ঠান্ডা জল ঢালা - যা প্রকৃত পক্ষে বৈজ্ঞানিকভাবে পুরুষাঙ্গকে সংকোচিত করে।

আমরা যখন এই সব আতঙ্কের বিরুদ্ধে প্রচার চালাচ্ছি তখন অনেকেই প্রশ্ন করেছিলেন এই আতঙ্ক জেলার পর জেলায় ছড়িয়ে পড়ছে কিভাবে ? বিজ্ঞান মনস্ক মন নিয়ে আমরা জানতাম এর পিছনে ষড়যন্ত্র আছে। কিন্তু হাতেনা হাতে প্রমাণ পাই নি। তবে বেশী অপেক্ষা করতে হয়নি দক্ষিণ ২৪ পরগণায় বেশ কয়েকটি জায়গায় ১৫০ টাকার রোজে এই আতঙ্ক ছড়ানোর কাজে নিযুক্ত কর্মীদের ধরা পড়া এবং গণধোলাইয়ের ঘটনা সমস্ত সংশয় দূর করে দিয়েছে, প্রমাণ হয়েছে অলৌকিকতার নামে যাবতীয় কুসংস্কার মুষ্টিমেয় মানুষ প্রচার করে স্বার্থন্বেষী দৃষ্টি নিয়ে। সময় বদলালেও যেহেতু সমাজে আজও শ্রেণী বিদ্যমান তাই এর বিরুদ্ধে লড়াই নিছক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই নয়, সমাজের শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই। সুকৌশলে অবৈজ্ঞানিক প্রচারের দ্বারা বৈজ্ঞানিক সত্যকে মিথ্যা রূপে প্রতিপন্ন করার গোয়েবেলসের তত্ত্ব নতুন কিছু নয়। আজানার কারণে দৃঢ়তার অভাবে গোয়েবেলসের তত্ত্ব সাময়িকভাবে জয়ী হলেও স্থায়ী হয় না। তাই ডিস্কো রোগ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় প্রবাহিত হয়েছে, কিন্তু কোথাও স্থায়ী হয় নি। গোয়েবেলসের তত্ত্ব দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তিকে সুস্থ করতে এবং সুস্থ ব্যক্তিও যাতে আক্রান্ত না হয় তার জন্য বিজ্ঞান মনস্ক মানুষকে বৈজ্ঞানিক সত্য এর প্রচার ও প্রসার ঘটানোর কাজে সর্বদা প্রয়াস জারি রাখতে হবে।

বিজ্ঞান মনস্কের কর্মীরা উঃ ২৪ পরগণা ও দঃ ২৪ পরগণার বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে, এলাকার মানুষকে সঙ্গে নিয়ে এই কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সাধ্যমতন পাল্টা প্রচার রেখেছে এবং আশাতীত সফলতা লাভ করেছে। কয়েকটি ব্লকে জনগণের স্বাক্ষরিত ডেপুটেশন জমা দেওয়া হয়েছে। এই গুজব দ্বারা আতঙ্কিত মানুষের অসহায়তার সুযোগের সদ্ব্যবহার করে কিছু ডাক্তার অপ্রয়োজনীয় ঔষুধ বিক্রির ব্যবস্থা করে এবং কিছু ওঝা, বদ্যি, গুনিন বিভিন্ননামের শিকড়-বাকড়-বিক্রি করে।

গোয়েবেলসরা কিছু দিন পর পর এমনই আজব গুজব ছড়িয়ে গণহিস্টিরিয়া সৃষ্টি করে তাদের বিচরণ ক্ষেত্রর বিদ্যমান মানুষের (জনতার) অজ্ঞতার পারদের উচ্চতা পরিমাপ করে।

আসুন, আগামী দিনে গোয়েবেলসদের কুচক্রকে প্রতিহত

কবিতা

ভেজাল এবং ভেজাল

অন্যরূপ

ঘুম থেকে উঠে দেখি
মা বড়ো চিন্তিত
হাতে ধরা কাগজটা
চোখ আকাশেতে ন্যস্ত।

বলি, 'মা, হয়েছে কি ?
ইস্কুলে যেতে হবে
দুধটুকু দেবে না কি ?'

সম্বিত ফিরে পেয়ে
মা বলেন, 'থাক্ থাক্
দুধ আজ খাস নাকো
দুধে নাকি ইউরিয়া
হবে নাকি রোগ ভোগ।

বাবা এসে ডাক দেন
'চা টা কি পাওয়া যাবে ?
সকালেতে কেন বসে
স্থানু হয়ে এভাবে ?'

মা বলেন 'না, না, না
চা-টা আর নয়
পড়ে দেখ কাগজেতে
কি লিখেছে পাতাময়।'

সরষের তেলে নাকি
শেয়াল কাঁটার বীজ
চায়েতে কাঠের গুঁড়ো
চালেতে মেশানো থাকে
অ্যাস্‌বেস্‌টস্ গুঁড়ো।

কোল্ড ড্রিংকস্ এও তেল
হলুদে ক্রোমেট লেড
কি দিয়ে যে খেতে দেব
তোমাদের আমিগো ?

বাবা-আমি চমকাই
মনে বড়ো ব্যথা পাই
কবি সুকান্ত নেই
তবু ভেজাল গীত গাই
এ কোন সকাল হ'ল
সকল-ই গরল ভেল ?

●*গণ হিস্টিরিয়া এবং কেন ?*

করতে, "বিজ্ঞান মনস্ক"-এর আলোকে জোটবদ্ধ হই।

গত ২-৩ মাস যাবৎ এই আতঙ্ক যখন উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে পড়ছে তখন সরকার পক্ষ বা বিরোধী পক্ষ তাদের প্রচার মাধ্যমের দ্বারা জনগণকে সচেতন করেনি। কিন্তু কেন ? সরকারপক্ষ ও বিরোধী পক্ষেরতো প্রতিটি জেলাতে সংগঠন আছে। তাই বলা যায়, তারা চায় এই আতঙ্ক মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ুক – আর আতঙ্কিত মানুষের মানসিক অবস্থার চাক্ষুষ উপলব্ধি করার জন্যই প্রতিটি রাজনৈতিক এবং অরাজনৈতিক দল, এমনকি এন জি ও গুলিও নীরব দর্শকের ভূমিকায় আসীন ছিল। জনগণের মানসিক অবস্থা পরিমাপের পর - শাসকশ্রেণীর সংবাদ মাধ্যম এ বিষয়ে মুখ খুলেছে - বলেছে এটি কোন রোগ নয়।■

নাটক

ভেজালের জালে

রচনা – অন্যরূপ
প্রয়োগে – বিজ্ঞান মনস্ক

চরিত্র : বাড়ীর কর্তা, বাড়ীর গিন্নী
নেপথ্যে সঙ্গীত

কোরাস :

ভেজাল বুঝি ঘর ভেঙ্গেছে
মন ভেঙ্গেছে মানুষের
ভেজালের এই দুনিয়াতে
থাকবো কিসের আশ্বাসে?

ও মন ভেজাল শুধু খাদ্যে নয় রে
ভেজাল মনের অন্দরে
(সেই) খারাপ মনটা নাইয়ে নেনা
চলনা খাঁটির সন্ধানে।

(ও মন) দুনিয়াতে থাকবি ক'দিন
ভাল কিছু করনারে
মরে গিয়েও বেঁচে র'বি
সব মানুষের অন্তরে।

গিন্নী : নমস্কার, নমস্কার।
দেখেছেন ভেজাল নিয়ে আবার গানও বাঁধা হয়ে গেছে। তা আর হবে না যা চলছে চারদিকে! আর এই দেখুন না আমারই কি অবস্থা!
সকালে উঠেই পেলাম সেই সংবাদপত্র, যার প্রথম পাতাতেই কিনা বিস্ফোরণ –
আপনারা ভাবছেন বিস্ফোরণ কিসের –
এইতো বেশ আছি –
না না। ঐটা পড়ার পর থেকেই ঐ গানটার মতো আমার দশা – "ভেজাল বুঝি ঘর ভেঙ্গেছে / মন ভেঙ্গেছে মানুষের –"
আপনারা কৌতুহলী হয়ে পড়েছেন তো? যে কি এমন খবর যা আমার সংসার, হৃদয় সব ভেঙ্গে দিল!
দাঁড়ান কাগজটা নিয়ে আসি। এ্যাঁ হ্যাঁ।
এই যে শুনুন তবে –
●সরষের তেলে নাকি শেয়ালকাঁটার বীজ এবং রেপসীড মেশানো থাকে – যা খেলে হাত-পা ফুলে যায়, পেট খারাপ হয়।
●দুধে নাকি জল, ইউরিয়া – যা খেলে পেট খারাপ ও কিডনি'র সমস্যা হয়।
●চা'য়ে কাঠের গুঁড়ো বা অন্য রঙ্গীন পাতা – এতে ক্যান্সার পর্যন্ত হতে পারে।
কি বুঝছেন? এমনি হাজার একটা ফর্দ দেওয়া আছে রোজকার খাবারে – যাতে সুস্থ্য শরীরে নানা রকম রোগের বসতি হতে পারে।
কি? আর পড়ব? না না। আর পড়ে কাজ নেই – আপনারাও সব মনে প্রাণে চমকে উঠেছেন - বেশ বুঝতে পারছি!
তা হ'লে আমার অবস্থাটা ভাবুন।
মেয়ে সকালে স্কুলে যাবে – দুধটাই শুধু খেয়ে যায়। বললে "মা দুধ দাও" – মা দুধ দেবে কি? মা'র তো হতজ্ঞান অবস্থা – কোন প্রাণে মেয়েকে ঐ অপরিচ্ছন্ন দুধটা দিতে পারি?
আপনারাই বলুন?

তারপর কর্তা এসে বললেন –

[স্বামীর প্রবেশ।]

স্বামী : কি ব্যাপার? সাত সকালে কি এত আকাশ পাতাল ভাবতে বসেছ? চা'টা হবে না নাকি?"

গিন্নী : পড়ে দেখো। (হাতের কাগজটা বাড়িয়ে দিয়ে)
চা কি খাওয়ানো উচিত, এ সব পড়ার পরও?
আর রান্নার সেই অপরিহার্য্য জিনিষ – হলুদে কি আছে জানেন? 'লেড ক্রোমেট' এতে রক্তাল্পতা, পক্ষাঘাত হয়।
রান্না ঘরে আর যাব না বাবা – কি মজা রান্না ঘরে আর যাচ্ছি না।
আমার কর্তাটির দেখলাম এ'সব পড়েও কোনও হেলদোল নেই। দিব্যি রসিকতা করলেন এসব নিয়ে।

স্বামী : আরে অত ভাবনার কি আছে? এই নিয়েই তো জীবন।
"এ ভেজাল জীবন
এ ভেজাল মরণ আমাদের
সব কিছু হাতের মুঠোয় –"

গিন্নী : আ মরণ। গলায় অতো গান যে কি ক'রে আসে তা জানিনে বাপু। তাও যদি একটু সুর থাকত। রান্নাটা তো ছাই পাঁশ দিয়ে ক'রে প্রিয়জনের মুখে তুলতে হয় না – রোজগার করেই খালাস!

তো সেই কথাই বলছিলুম কর্তাকে, যে কাগজে তো দুচারটে জিনিষ নিয়ে লিখেছে। বড় বড় কোম্পানীগুলো তাদের বড় কারখানার অন্দরে বসে কি করছে তা জানা যায় না – খবরের কাগজওয়ালারা না ছাপালে – কিন্তু ছোট ব্যাপারীদের বিশেষ করে বাজারের ব্যাপারীদের কাজ কারবার সব প্রকাশ্যে। আমি বাজারে নিজের চোখে রাঙালুকে গোলাপী রঙে চুবিয়ে সুন্দরী ক'রে তুলতে দেখেছি – বা, নীল রঙ্গে চুবিয়ে উচ্ছে-পটলকে সবুজ।

ঠিক যেমন রজনীগন্ধার স্টিক রঙে চোবায়!

হ্যাঁগো ওগুলো কি ভাল রঙ?

তিনি পন্ডিত মানুষ – সঙ্গে সঙ্গে বলে দিলেন –

স্বামী : ভাল রঙ কি গো?

গোলাপীটা রোডামিন বি – ওতে বৃক্ক, যকৃৎ আর প্লীহার নানারকম রোগ হতে পারে।

সবুজ হল – ম্যালাকাইট গ্রীন – ফুসফুসে সংক্রমণ, ওভারি এবং লিভারে টিউমার হতে পারে।

গিন্নী : ও মাগো! কি সর্বনেশে কথা। যাক্ গে। বাঙ্গালীর মাছ? সেটাতে তো রঙ দিতে পারবে না?

আবার সেই অমোঘ বাণী –

স্বামী : আরে আছো কোথায় গিন্নী –

মাছের কানকো'কে টকটকে লাল দেখাতে ব্যবহার করে অরামিন – যার ফল শ্বাসকষ্ট ও পেট ব্যাথা।

১৫ দিনের বাসি মাছকেও তাজা দেখাতে ব্যবহার করে কেমিক্যাল।

গিন্নী : নাঃ আর সহ্য সহ্য হচ্ছে না। এর একটা বিহিত হওয়া দরকার। আচ্ছা বিহিত কিভাবে করা যায় বলুনতো? আবার কর্তাকেই শুধাই –

হ্যাঁ গো তোমাদের সরকারী দপ্তরগুলোরই তো এসব দেখ ভাল করার কথা – ওরা দেখেনা কিছু – ওদেরও তো ছেলেপুলে আছে?

আমার জ্ঞানী ও রসিক কর্তাটি বললেন –

স্বামী : তা হলেই হয়েছে আর কি? শোন তবে –
জিনিষে ভেজাল দিয়ে / যে জন প্রফিট খোঁজে
সে লও মোর নাম রে / সময়ে বাহির হ'ব
হকের পাওনা বুঝে নেবো / তুমি লও মোর স্মরণ রে।

গিন্নী : বুঝলুম, বুঝলুম সর্ষের মধ্যেই ভূত! কিন্তু বিষয়টা যখন আমাদের কুরে কুরে খাচ্ছে তখন তো ছেড়ে দিলে চলবে না। সরকারকেই হাল ধরতে হবে।

স্বামী : হাল তো সরকারের হাতেই, তবে পানি পাবে তো?

গিন্নী : পানি পাবেনা কেন? সরকারের তো বড় বড় ব্যবসায়ীদের কন্ট্রোল করার অনেক নিয়ম কানুন আছে – ভেজাল ধরার ডিপার্টমেন্টও আছে শুনেছি – সেগুলো লাগু করেনা কেন?

আর হাটে-বাজারে যত শব্জী ব্যাপারী, মাছ ব্যাপারী কিসে কী মেশাচ্ছে তার জন্য তো পঞ্চায়েত, মিউনিসিপ্যালিটি, কর্পোরেশনের তৎপর হওয়া দরকার।

না কি বলেন আপনারা?

[বাইরে কড়া নাড়ার শব্দ।]

কে? কে গো – ওই ডিমওয়ালী মনে হচ্ছে – কিগো – নানা তোমার ওই ময়ূরের থুড়ি মুরগির ডিম এখন নিতে পারব না। সামনের হপ্তায় এসো।

দেখুন না – এই ডিমওয়ালীর ব্যাপারটাই দেখুন – প্রথম প্রথম ও পায়রার থুড়ি মুরগির ডিমই নিয়ে আসত বলে আমার ধারণা – খুব ছোটো ছোটো লাল লাল যেমন হয় আর কি!

কিন্তু এখন দেখছি সাইজটা বেজায় বড় –

বলছে দেশী মুরগি নাকি আজকাল এরকমই ডিম দিচ্ছে।

মনটা খুঁত খুঁত করে – তবু নিই। হঠাৎ একদিন কার মুখ থেকে শুনলুম ওগুলো আসলে ময়ূরের ডিম – শস্তায় কিনে বেশী দরে বিক্রী করে।

বুঝুন একবার – এর কি উপায় আপনারা বলুন দেখি?

স্বামী : যাই হোক না কেন ডিমে তো আর সবুজ গোলাপী রঙ নেই – সেটাই অনেক!

গিন্নী : তা যাকগে – মরুক গে –
ওই রঙ টঙের ব্যাপারে যা বলছিলুম আর কি? আচ্ছা যারা খাবারে এইসব রঙ মেশাচ্ছে তাদের ছেলেপুলেরাও তো ওইসব খাচ্ছে!

স্বামী : ঠিক! কোল্ড ড্রিংক্স-এ তেল মেশানো কোম্পানি-র মালিকের ছেলে তো সাবান মেশানো আইস ক্রীমও খাচ্ছে এবং এর বিপরীতটাও হচ্ছে।

গিন্নী : আবার চালের ব্যাপারী। অ্যাসবেসটস গুঁড়ো মেশানো চাল তো, মাছের কানকোয় অরামিন দেনেওলা ব্যবসায়ীকে বিক্রি করছে। আবার উল্টোটাও হচ্ছে – তাহলে?

স্বামী : পুরো ব্যাপারটাই যেন একটা অদৃশ্য জাল আমাদের আষ্টে পৃষ্ঠে জড়িয়ে ফেলেছে।

গিন্নী : এটা কি নেট বলুন তো? লোকাল না গ্লোবাল? শুনুন ভাই – আমার তো মনে হয় নেটটা গ্লোবালই হবে। মানে সারা পৃথিবীব্যাপী ভেজালদারেরা জাল পেতেছে – কেননা – মাল্টিন্যাশানাল কোম্পানিগুলোর আইসক্রিম, কোল্ড ড্রিংক্স ছাড়াও চাইনিজ খেলনাগুলোর কথাই ধরুন –

স্বামী : এমন সব বর্জ্য পদার্থ দিয়ে তৈরী যে বাচ্চাদের স্কিন ডিজিজ বা অন্য কোনও অসুস্থতা দেখা দিচ্ছে।

গিন্নী : তাহলে, তাহলে মুক্তি কোথায় – মুক্তির পথ আমাদেরই
খুঁজে বের করতে হবে। শুনুন ভাইবোনেরা –

কোরাস :
সরকারের পাশাপাশি / আমাদের জীবন নিয়ে / এই মারণ খেলার প্রতিবাদ / আমাদেরই করতে হবে / পাড়ায়-পাড়ায় / গ্রামে-গঞ্জে / হাটে-বাজারে।

গিন্নী : 'ওরা অজ্ঞান, ওরা জানে না ওরা কি করছে – প্রভু ওদের ক্ষমা করো'
– বলে বসে থাকার দিন কি আছে? যারা জানেনা তাদের জানাতে হবে। যে কেমিক্যাল মেশাচ্ছে তার ফলাফলটা হয়তো সত্যিই ওরা জানেনা – কিম্বা জানে। হয়তো জেনেশুনে বিষ দিচ্ছে – আর সেই বিষ আমরা পান করছি।
কিন্তু "প্রাণের আশা ছেড়ে সঁপেছি প্রাণ" – এমন তো আমাদের দশা নয়?

কোরাস :
তাই আসুন / সরকারের কাছে আমাদের দাবী জানাই / ভেজালের বিরুদ্ধে / তাদের দফতরগুলোর সক্রিয়তার জন্য।

গিন্নী : আর সুধীজন –

কোরাস :
আপনাদের কাছে অনুরোধ / ভেজালদারদের / সমাজের দুরাচারী জ্ঞান করুন / তাদের বিরুদ্ধে / সরব হোন।

সুধীজন হে ... ২
শুধাই প্রশ্ন জনে জনে ...

মোদের খাবার লইয়্যা রঙ তামাশা
রঙে চুবাইয়া দ্যাখে মজা কে?
(মোদের) পোলার লাইগ্যা সুস্থ জীবন
কাইড়্যা লয় কে?
ও আমার সুখের সকাল কালো করে কে?

খোঁজ লাগাও হে বাবুমশাই
তত্ত্বতালাশ করো
দিন দুপুরে এই ডাকাতি ২
সহ্য হয় না বড়ো।

সুধীজন হে
সুধীজন হে ...
বিবেক কার ঘুম্যায়ে পড়ল
কড়া নাড় তারি চেতনায়
দৃষ্টি তোমার সজাগ রাখা চাই
মেনে নেবার দিন তো হাতে নাই।

খোঁজ লাগাও হে বাবুমশাই ...
তত্ত্বতালাশ করো
দিন দুপুরে এই ডাকাতি ২
সহ্য হয় না বড়ো ...

গল্প

‘এক টুকরো জীবন’

সৌরভ সর্দার

ভোঁ-ভোঁ শব্দে সকলেরই প্রায় ভোর চারটেয় ঘুম ভাঙত। তিন বোন লেপটা টেনে নিয়ে পাশ ফিরে শুতাম। সবার আগে বাবা উঠে পড়তেন; মাকে ডাকতেন। তারপর চলত রান্না ঘরে হাঁড়ি-কড়া আর খুন্তির দারণ লড়াই। মা আমাদের নাম ধরে চিৎকার করে বলতেন, “মেয়েগুলো বড় হচ্ছে, কোথায় মায়ের হাতে হাতে কাজ করবে, তা-না, শুধু পড়া আর ঘুম; সব বড় ডাক্তার-উকিল হবে।” বাবা মাকে ধমক দিয়ে বলতেন, “চিৎকার করছো কেন ? মেয়েগুলোকে একটু শান্তিতে ঘুমোতে দেবে তো, পড়াশুনা কত পরিশ্রমের কাজ তা জান ?” মা বলতেন, “তা আর জানব না; তোমার মেয়েদের দেখেই তো শিখছি। কোনো কাজের কথা বললেই “পড়ছি-লিখছি”; আর, এ ছুটকিটা; সে তো সব সময় ছবি আঁকছে।” বাবা বলতেন, “তবে তুমি যাই বল; আমাদের রেণু কিন্তু খুব সুন্দর ছবি আঁকে। দেখবে একদিনে ও খুব বড় শিল্পী হবে।” তারপর আমরা সব একে একে উঠতাম। আমাদের দেখে মা বাবাকে বলতেন, “সেই তোমার রাজকন্যেরা উঠছেন, কাজে যাওয়া বন্ধ করে ব্রাশটা মুখের কাছে দিয়ে এসো”। মাকে রাগানোর জন্য তনু বলত, “মহারানী অত রেগে আছেন কেন মহারাজা ?” বাবা হেসে বলতেন, “কী-ই কেমন জবাবটা দিল ? এই না হলে আমার মেয়ে”। তারপর আমরা তিন বোন কেউ বাবার টিফিন, কেউ জামা কিংবা জুতো এনে দিতাম। রেণু বলত, “বাবা একটা ভালো তুলি আনবে তো।” তনু বলত, “বাবা একটা ভালো কাজল আনবে তো।” বাবা আমাকে জিজ্ঞাসা করতেন, “অনু মা, তোর কিছু লাগবে না?” –হ্যাঁ, বাবা একটা রঙীন সুতো নিয়ে এসো। বাবা হয়তো কোনদিন তুলি আনতেন, কাজল আনতেন; কিন্তু সূতো আনতে পারতেন না। কিংবা কোনোদিন সূতো আনলেও রং-তুলি আনতে পারতেন না। মা যখন আমাদের তিনজনকে খেতে দিতেন, আমি বলতাম, মা, একটু আচার দাও না। তনু বলত, “মা একটু ঝোল দাওনা।” রেণু বলত, মা একটু আলু দাওনা। মা কোনদিন ঝোল বা আলু দিতে পারতেন; কিন্তু, আচার দিতে পারতেন না। কোনদিন বা ঝোল, আচার দিতে পারতেন; কিন্তু আলু দিতে পারতেন না। আমরা বাবা-মাকে খুব ভালবাসতাম। আমাদের চাওয়া ছিল খুব সামান্য; আমাদের পৃথিবী ছিল ছোট; কিন্তু, সুন্দর। বাবা জুট মিলের শ্রমিক ছিলেন। মা সেলাই মেশিনে প্রতিবেশীদের জামা-কাপড় সেলাই করতেন। মা-বাবা খুব পরিশ্রম করতেন; আর, আমাদের খুব ভালবাসতেন।

একদিন খুব বেলা হল; কিন্তু, ভোঁ-ভোঁ বাঁশি আর বাজলো না। রান্নাঘরে কড়া-খুন্তির আওয়াজ আর শোনা গেলনা। ঘুম থেকে উঠে দেখলাম, মা গালে হাত দিয়ে বসে। বললাম, “বাবা কোথায় মা ?” মা বললেন, “কী জানিরে। ঘুম ভাঙতে উঠে দেখি বিছানাতে নেই। বাইরে এসে দেখলাম গরুর খড় দেননি। ভাবলাম অন্য কোথাও হয়তো গেছেন। কিন্তু, কিছুক্ষণ আগে হারাধনের বউ এসেছিল। হারাধনও নাকি কাউকে কিছু না বলে, না খেয়ে চলে গেছে।” সকলে ভাবনায় পড়ে গেলাম। দিন কেটে অনেক রাত হল; কিন্তু বাবা কোথায় ? হঠাৎ বাবাকে ক্লান্ত শরীরে সদর দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। চোখ তাঁর ছলছল করছে। রেণু দৌড়ে গিয়ে বলল, “বাবা, তুমি কোথায় গিয়েছিলে ?” বাবা বললেন,“কাজে।” তনু বলল, “আজকে বাঁশি বাজল না কেন ?” বাবা বললেন, “আর বাজবে না।” আমি বললাম, “কেন বাজবে না বাবা” ? বাবা বললেন, “কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে।” মা আঁতকে উঠলেন, “কী বলছো গো ? কেন কারখানা বন্ধ হল ?” বাবা বললেন, “মালিক শ্রমিক ছাঁটাই করে উন্নত মেশিন বসাতে চাইছে। তাই শ্রমিকরা আন্দোলনে নেমেছে। আর মালিক

এই অশান্তির সুযোগে কারখানা বন্ধ করে দিয়েছে।" মা বললেন, "তাহলে কী হবে এখন ? ওরকম মেশিন কেন তৈরী হয়, যা মানুষের মুখের অন্ন কেড়ে নেয়।" বাবা বললেন, "তুমি কিছু চিন্তা কোরোনা। যতদিন এই গতরটা আছে কিছু একটা হবেই।"

এরপর আমাদের লেখাপড়া, ছবি আঁকা একে একে সব বন্ধ হল। আমি মায়ের সাথে জামা-কাপড় সেলাই করতে লাগলাম। তনু একজনের বাড়িতে কাজে লাগল। এরপর এমন একদিন এল যে, বাড়িতে আর আলো জ্বললনা; উনানে হাঁড়ি-চাপলনা। বাবার শরীরে জুটল কঠিন ব্যাধি। গয়না-জমি-বাসন-পত্র যা কিছু ছিল, তা বিক্রি-বন্ধক দিয়ে নিঃস্ব হলাম। আমাদের পরনের যা থাকল তা পরে বাইরে যেতে লজ্জা হত।

বিছানায় শুয়ে থাকা বাবার করুণ মুখ আর মায়ের কাতর দৃষ্টি আমার বয়সকে হঠাৎ বাড়িয়ে দিল। অবুঝ বোনদের আবদার মা-বাবার মত আমাকেও ভীষণ বিব্রত করত। একটা কাজ জোগার করে সংসারের হাল ধরতেই হবে এই ভাবনায় সকাল-সন্ধে ছটফট করতাম। পাড়ার কাকা-দাদাদের কাছে কাজের জন্য আবদার করতাম। যারা আশ্বাস দিত তাদের অনেকের চোখের চাউনি ভালো লাগত না, তবুও আমি মরিয়া হয়ে উঠেছিলাম। মা তনু আর আমাকে বার বার সাবধান করে দিত, কিন্তু আমার উপায় কি ছিল ? একদিন ভোম্বলদা একটা কাজের খবর নিয়ে এল, হোটেলের কাজ। বলল একটু সেজেগুজে যেতে হবে। কাজটা কী ? জানতে চাওয়ায় বলল "গেলেই জানতে পারবি, তবে মাসে ৫ হাজার পাবি, দেখ্ কি করবি। অনেক কষ্টে জোগার করেছি তোদের সংসারের অবস্থা দেখে। দেরী করলে কিন্তু হাত কামড়াতে হবে।" বন্ধুদের থেকে পোশাক ধার করে হোটেলে গেলাম। যেরকম আশংকা করেছিলাম তাই হল। ম্যানেজার বলল এখানে বড় বড় পার্টি হয়। আমায় মিউজিকের তালে তালে নেচে বাবুদের মদের নেশা বাড়াতে হবে। বিবেকের গলা টিপে হাজার টাকা অগ্রিম নিয়ে বোনদের জন্য জামা আর বাজার করে ফিরলাম।

ঘরের সামনে জটলা, মায়ের চিৎকার কানে এল। ছুটে ঘরে গেলাম। ফ্যানের সাথে তনু কাপড় গলায় ঝুলছে আর ছোট্ট রেণুটা বোবার মত সেদিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে।■

●১৬ *পৃষ্ঠার পর* *গ্লোবাল ওয়ার্মিং প্রসঙ্গে*

৯৯.৭২% কারণ প্রাকৃতিক।

এরপর আমাদের সামনে যে সমস্যা প্রধানভাবে দেখা দেয় তা হল – বিশ্ব পরিবেশ নিয়ে চিন্তিত IPCC-এর ও বিশ্ব পরিবেশ সম্মেলনে – আজ পর্যন্ত উন্নত দেশগুলির ক্ষেত্রে কার্বন নির্গমন কমানর বদলে বেড়েই চলেছে। আর অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলিতে কার্বন নির্গমন নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কার্বন ব্যবসা ও বন-সৃজন প্রকল্প লাগু করা হচ্ছে। একদিকে, প্রাকৃতিক ঘটনাকে মানব সভ্যতার বিকাশের কু-ফল বলা আর অন্যদিকে IPCC-এর ভূমিকা, কার্বন ব্যবসা এবং প্রতিটি বিশ্ব পরিবেশ সম্মেলনের ফলাফল, আমাদের সামনে পরিষ্কার করে দেয় যে, ফসিলফুয়েলের বিকল্পরূপে ইথানল বা পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার বাড়াবার চেষ্টা, আর পরিবেশ রক্ষার নামে বিভিন্ন যন্ত্রপাতির ব্যবসা বাড়ানো চেষ্টা। "গ্লোবাল ওয়ার্মিং"-এর মত প্রাকৃতিক ঘটনার কারণ রূপে যে অপবিজ্ঞানকে প্রচার করে মানুষের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করা হচ্ছে, সেই অপবিজ্ঞান-এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া উচিৎ। সেই অপবিজ্ঞান-এর স্বরূপ উদঘাটনের জন্য, আমরা "বিজ্ঞান মনস্ক"-র পক্ষ থেকে ১৮ই জুলাই ২০১০, বেহালার বিবেকানন্দ মহিলা কলেজের প্রেক্ষাগৃহে, বিশ্ব উষ্ণায়ন প্রসঙ্গে একটি সেমিনারের আয়োজন করেছিলাম এবং জনগণের সামনে আমাদের বক্তব্য নিয়ে যাই। এখানেই শেষ নয়। আমরা আমাদের এলাকার বিভিন্ন স্কুল-কলেজের সামনে, পোষ্টারের মাধ্যমে, এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য তুলে ধরেছি। পত্রিকার মাধ্যমে সকল পাঠক বন্ধুর কাছে আমাদের আহ্বান, "গ্লোবাল ওয়ার্মিং"-এর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে সঠিক বিজ্ঞানটি জানুন, আপনার পরিচিতদের জানান এবং নতুন কোন তথ্য ও তত্ত্ব আপনাদের জানা থাকলে চিঠি মারফৎ তথ্য/তত্ত্বের উৎসসহ আমাদের জানান।■

আবিষ্কার

রাইবোজোমের গঠন

২০০৯ সালে এক ভারতীয় বিজ্ঞানী ভেঙ্কটরামান রাজা রামকৃষ্ণা তার আরও দুই সহযোগী থমাস এ স্টেইটস ও আদা ই. ইয়োনোয়ের সাথে 'রাইবোজোমের গঠন ও কার্যপ্রণালী জন্য রসায়নে নোবেল পেয়েছেন।

প্রত্যেকটি সজীব কোষের ভেতরে ডি.এন.এ. অণু আছে, এই ডি.এন.এ. অণুগুলি সকল প্রাণীর বৈশিষ্টের রচনাকারী। কিন্তু এই ডি.এন.এ. জীবনের জন্য দায়ী নয় শুধুমাত্র বৈশিষ্ট বহনকারী। এই বৈশিষ্টগুলি জীবনে রূপান্তর হয় রাইবোজোমের মাধ্যমে। ডি.এন.এ.-এর তথ্যের মাধ্যমেই রাইবোজোম প্রোটিন তৈরী করে যা রক্তে হিমোগ্লোবিন বহন করে, প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলার জন্য অ্যান্টিবডি তৈরী করে, ইনসুলীন হরমোন তৈরী করে এছাড়াও আরও সহস্রাধিক কাজ করে এই প্রোটিনগুলি। এই প্রোটিনগুলিই রাসায়নিক ভাবে জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই তিন বিজ্ঞানী রাইবোজোমের সাথে বিভিন্ন অ্যান্টিবায়োটিক কিভাবে মিশে গিয়ে বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ করে তা নিয়ে একটি (এ-ডাইমেনশান) মডেল প্রস্তুত করেন। রাইবোজোমের সাথে অ্যান্টিবায়োটিকের কার্যপ্রণালী চিকিৎসা বিজ্ঞানে এক যুগান্তর ঘটিয়ে দিতে পারে। বর্তমানে ক্যান্সরে বা এইড্সের মতো দুরারোগে রোগের ওষুধও আবিষ্কার হতে পারে এই তিন বিজ্ঞানীর গবেষণার মাধ্যমে। আমরা বিজ্ঞান মনস্কের পক্ষ থেকে চিকিৎসা বিজ্ঞানে এই যুগান্তকারী আবিষ্কারকে কুর্নিশ জানাবার পাশাপাশি এর প্রভাব যেন ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর মানুষ পায় তারও আবেদন রাখি।

প্রিন্টিং মেশিন

কে আবিষ্কার করেছিলেন প্রিন্টিং মেশিন ? এক কথায় উত্তর জোহান্স গুটেনবার্গ। জন্ম জার্মানীর মেনজ শহরে ১৩৯৮ সালে। ভদ্রলোক ছিলেন পেশায় স্বর্ণকার। ১৪৪০ সালে তিনি প্রথম একটি যন্ত্র আবিষ্কার করলেন যার সাহায্যে একটি বইয়ের অনেক কপি করা যাবে। তাঁর যন্ত্রটিতে মুদ্রণ কর্মীরা ধাতুর তৈরির আলাদা আলাদা অক্ষর সাজিয়ে শব্দ, বাক্য তৈরি করতেন। গুটেনবার্গ প্রিন্টিং মেশিন আবিষ্কার করার সঙ্গে সঙ্গে সারা ইউরোপে শুরু হয়ে গেল তার ব্যবহার। পড়াশুনার জগতে ও বাইরের দুনিয়ায় বিপ্লব ঘটে গেল। খুব তাড়াতাড়ি সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ল ছাপার এই বিশেষ পদ্ধতি। ১৪৫৫ সালে গুটেনবার্গ ছাপলেন একটি বাইবেল।

রোবট

জাপান আবিষ্কার করেছে অত্যাধুনিক এক রোবট নাম টি-৩৪। দেখলে মনে হয় যন্ত্রটি নেহাতই নিরীহ, কিন্তু চোর-ডাকাত ধরতে দারুণ ওস্তাদ। এর গতি ঘন্টায় দশ কিলোমিটার। এর দেহে আটকানো আছে মাইক্রোফোন এবং বডি সেন্সর – অনধিকার প্রবেশকারীকে কুপোকাত করে ফেলবে এক নিমেষে। যদি কেউ বাড়ির বা অফিসের জানলা বন্ধ করতে ভুলে যায় বা ডেস্কের উপর থেকে মাটিতে পড়ে যায় কিছু, কিম্বা দরজা ঠিক মতো বন্ধ না হয়ে থাকে তাহলে এলার্ম বাজিয়ে সাবধান করে দেবে সে।

বিজ্ঞান মনস্ক আয়োজিত দুই দিন ব্যাপী
সাংস্কৃতিক ও গণসচেতনতা বৃদ্ধিকারী অনুষ্ঠান

প্রতিযোগিতামূলক◆প্রদর্শনমূলক◆আলোচনামূলক অনুষ্ঠান

স্থান : ব্রতচারী বিদ্যাশ্রম, জোকা, কলকাতা - ১০৪ (ঠাকুরপুকুর ৩এ বাসস্ট্যান্ডের নিকটে)

২২শে জানুয়ারী ঃ দুপুর ২টা থেকে রাত ৯টা এবং ২৩শে জানুয়ারী ঃ সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা

প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য নাম দেওয়ার শেষ তারিখ ঃ ১৮ই জানুয়ারী

ঠিকানা

অপন মোতিলাল
১১৪ মাঝিপাড়া রোড, দীপ্তিকনা অ্যাপার্টমেন্ট
ফ্ল্যাট - এ ২, কলকাতা - ৬৩
মোবাইল : ৯২৩১৮৮৮৪৪১

শিশির কর্মকার
সোনারপুর বৈদ্যপাড়া
কলকাতা - ১৫০
মোবাইল : ৯৪৩২৩০০৮২৫

বিজ্ঞান মনস্ক'র পক্ষে নন্দা মুখার্জী ৪৭, বিবেকানন্দ সরণী, পূর্ব বড়িশা, কলিকাতা - ৭০০০৬৩, কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীকৃষ্ণ প্রিন্টিং ৩০, বিধান সরণী, কলকাতা - ০৬ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক ঃ শিশির কর্মকার ঃ ৯৪৩২ ৩০০৮২৫ প্রকাশক ঃ নন্দা মুখার্জী ঃ ৯৮৮৩ ২৯৯৯২৮